মুদীর দোকান

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(সচিত্র)

শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত।

"ঋতাষাট্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বতস্যৌষধয়ো
অপ্সরসো মুদো নাম তাভ্যঃ স্বাহা।"

বেদ-মন্ত্র

১৩৪০ বৈশাখ।

মুল্য ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীপরেশ নাথ দত্ত।
৬।১ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন,
কলিকাতা।

১৩১৬ সালের আষাঢ় মাসে (২৫ বৎসর পূর্ব্বে) এই "মুদীর দোকান" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রীধর প্রেসে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।
২৩নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

মুদীর দোকানের এই ভোজ্য সামগ্রীগুলি স্বর্গীয় পিতৃদেব হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের উদ্দেশে, তাঁহার প্রমোদনার্থে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উৎসর্গ করা হইল।

মুদির দোকান

সূচী।

চিত্রসূচী ।

—:❋:—

উপক্রমণিকা

-:*:-

শ্রীমান্ ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত 'মুদীর দোকান' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি হইল। পাঠক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন অদ্যকার এই কাব্যকলামুখরিত ভাবোচ্ছ্বাস-প্লাবিত, পাশ্চাত্যভাবানুপ্রাণিত বঙ্গে 'মুদীর দোকানের' অবকাশ কোথায়? উত্তরে বোধ হয় গ্রন্থকার বলিবেন—কেবল কাব্য কলায় প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণায় লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, সুতরাং লোকযাত্রা রক্ষার নিমিত্ত মুদীর দোকান আবশ্যক। আমরাও এই কথা বলি। আমরা এক্ষণে সকলেই প্রাত্নতত্ত্বিক হইয়া শিলালিপি, বৌদ্ধদর্শন, ভাষাতত্ত্ব, অক্ষরতত্ত্ব, বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিজ্ঞজনোচিত গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত; ইহার ফলে আমাদের আর ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর কথা ভাবিবার সময় নাই। শ্রীমান্ ঋতেন্দ্রনাথ এই 'ভূতের' দৌরাত্ম্য হইতে 'বর্ত্তমানের

রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে গবেষণা করিতে হইলে যে কেবল গোপনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ভ্রমবহুল মতের অনুসরণ করিয়া প্রকাশ্যে স্বাধীন চিন্তার ভান করিয়া বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই, পরন্তু আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যে আমাদের গৃহে ও আমাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গবেষণার সামগ্রী আছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যে অভিজ্ঞ ও তাঁহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্য ও স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। তাঁহার মৌলিকতা এই গতানুগতিকতার দিনে অবশ্যই প্রশংসার্হ ও অনুসরণীয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার 'তামাক ও ধূমপান' নামক প্রবন্ধটী বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ঐ প্রবন্ধে, যাহা সাহিত্যসভার কোন অধিবেশনে পঠিত হয়, তিনি 'তামাক' যে বৈদেশিক দ্রব্য নহে পরন্তু দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন রামায়ণোল্লিখিত তমালেরই নামান্তর তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ঐ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহে। ফলতঃ ঐগুলি

অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে 'তাম্রকুটের' বৈদেশিকত্ব সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সংশয় জন্মে। পাঠক ঐ প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। ঐ প্রবন্ধে 'cigar' এই শব্দটি 'ইষিকা' এই শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাঠক প্রবন্ধের ঐ অংশ পাঠ করিলেই প্রতিপাদনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবেন। কেবল 'তামাক ও ধূমপান' প্রবন্ধে কেন, অন্যান্য প্রবন্ধেও বিশেষতঃ 'খাবারের নামতত্ত্ব', 'লুচি তরকারি', 'সন্দেশ' প্রভৃতি প্রবন্ধেও অনেক নূতন কথার অবতারণা দেখিতে পাইবেন ও অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিবেন। তাঁহার গবেষণার ফলে পাঠক দেখিবেন যে, এককালে হিন্দুর প্রাচীন আচার প্রথা দেশ বিদেশে শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হইয়াছিল * ও ইউরোপীয় অধিকাংশ পিষ্টকাদির নামগুলি বৈদিক সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 'omelett' এই শব্দটি বৈদিক 'অম্বরীষ' ও 'bread' এই শব্দটি বৈদিক 'ভ্রাষ্ট্র' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'অম্বরীষ' হইতে 'omelett' এর উৎপত্তি একটু কষ্ট কল্পনা সিদ্ধ

বলিয়া বিবেচিত হইলেও 'ভ্রাষ্ট' হইতে 'bread'এর উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বোধ হয় সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইরূপ German 'সমারন্‌' (ঘৃতসম্বরিত রুটি) যে সংস্কৃত পাকশাস্ত্রোক্ত 'সম্বরণ' হইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়েও সংশয় নাই। ফলকথা উপ-রোক্ত প্রবন্ধগুলি ঔদরিক মহোদয়দিগের বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ্য। ঐগুলি ইংরাজিতে লিখিত ও এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে প্রকাশিত হইলে অনেক প্রাত্নতত্ত্বিক মহামহোপাধ্যায়ের উপজীব্য হইত সন্দেহ নাই। সকল প্রবন্ধেই এইরূপ সাধারণের অনালোচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব নানা কথা আছে। ঐগুলি পাঠ করিলে পাঠক অনেক বৈদেশিক বস্তু ও বৈদেশিক আচারকে স্বদেশীয় বলিয়া আদর করিতে শিক্ষা করিবেন ও অনেক 'স্বদেশী' মহোদয় নিঃসঙ্কোচে তৎসমুদায় উপভোগ করিয়া স্বীয় রসনা, বাসনা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিবেন। ফলকথা এই যে 'মুদী ও মুদীর দোকান' অতঃপর উপেক্ষার বস্তু নহে। 'মুদীর' বৈদিক আভিজাত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও—আর সন্দেহই বা কোথায়—কারণ মুদী ত বৈশ্য, হয়ত

কয়েকদিন বাদে বৈশ্যত্বের দাবী করিয়া উপনয়ন লইবেন—তাঁহার মুদিত্ব বা মোদকত্বের অপলাপে বোধ হয় কেহই সাহসী হইবেন না। এই নীরব, গ্রাম্য গন্ধসুলভ নাম দেখিয়া যেন কেহ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উপর বিরক্ত না হন, কারণ এ দোকানে যে কেবল নিত্যব্যবহার্য্য তণ্ডুল, দ্বিদল, তৈলাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নহে লুচি, সন্দেশ, bread, omelett, কমলালেবু, সিগার প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয়—দেশীয় ও বিদেশীয় রসনা ও ঘ্রাণতর্পণ দ্রব্যেরও সমাবেশ আছে। পাঠকগণ স্ব স্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে তৎসমুদয় উপভোগ করুন ইহা আমাদের প্রার্থনা। জানি না বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীমান্ ঠাকুরের ন্যায় কয়জন 'পাকা মুদী' আছেন।

৩০ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের গলি।
৩০শে জুন, ১৯০৯।

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী

মুদী

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। প্রাণো বা অন্নং। অন্নাদ্ধৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং"। "অন্নের নিন্দা করিও না ; অন্নই প্রাণরূপ, অন্ন হইতে প্রজাসমূহ উৎপন্ন হয় ; অন্ন প্রাণীগণের জ্যেষ্ঠ।" যে বৈদিক কালে এমন উদার ভাবে ভোজ্যদ্রব্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই কালে যে অন্নের আদর কিরূপ উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সেই বৈদিক কালে অন্ন বা আহার বিষয়ে এত সঙ্কীর্ণতা ছিল না—অমুক ঐ দ্রব্য আহার করিয়াছেন, তবে তাহাকে জাতিতে লওয়া হইবে না—জাতিচ্যুত করা হইবে, এই-রূপ সঙ্কীর্ণ ভাব সেকালে বড় ছিল না। একালে আহার

বিষয়ে যে আমাদের মধ্যে কিরূপ সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় পাইয়াছে, আমাদের 'সঁকড়ি' শব্দটী তাহার কতকটা পরিচায়ক। 'সঁকড়ি' শব্দটী 'সঙ্কীর্ণ' বা "সঙ্করী-করণ" শব্দ হইতেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। "সঙ্করী" যে 'সঁকড়ী'র মূলে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'সঙ্কীর্ণ' ও 'সঙ্করী-করণ,' উহাদের মূল ধাত্বর্থ একই। যাহাতে সঙ্কীর্ণতা আসে, তাহাই আর কি 'সঙ্করী-করণ' বা সঙ্কীর্ণতা আনয়নকারী ; যেমন, শাস্ত্রে আছে পশুহিংসা করিলে "সঙ্করীকরণ" হয় ; হিংসার দ্বারা চিত্ত সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

"গ্রাম্যারণ্যানাং পশূনাং হিংসা সঙ্করীকরণম। সঙ্করী করণং কৃত্বা মাসমশ্নীত যাবকম্, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং অথবা প্রায়শ্চিত্তন্তু কারয়েৎ।"

"গ্রাম্য বা আরণ্য পশুর হিংসা করিলে 'সঙ্করীকরণ' হয় ; সঙ্করীকরণ কার্য্য করিলে এক মাসকাল যাবক আহার করিবে—অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

বিষ্ণু-সংহিতা—৩৯ অধ্যায়।

ভাত ডাল প্রভৃতি, আত্মীয়স্বজনরূপ গণ্ডীর মধ্যে ব্যতীত যাহার তাহার সঙ্গে খাওয়া যায় না—কেমন সঙ্কীর্ণতা আসে, তাই উহার বেলায় সঁকড়ির ধূম পড়িয়া যায় ; কিন্তু লুচি পিষ্টক প্রভৃতি সামগ্রী যাহা সকলের হাতে সকলের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া যায়, তাহাতে 'সঁকড়ি দোষ' স্পর্শ করে না। এই সঙ্কীর্ণ ভাব বৈদিক কালে বড় একটা ছিল না।

অন্ন কাহাকে বলে ? বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—

"অদ্যতে অত্তি চ ভূতানি
তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

"যাহা প্রাণিগণ আহার করে তাহারি নাম অন্ন।"

মনু বলিতেছেন—

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনং॥

(মনু ৫ম অধ্যায়)

"প্রজাপতি কি প্রাণী কি উদ্ভিদ এ উভয়ই জীবের অন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব উদ্ভিদাদি স্থাবর এবং মাংসাদি জঙ্গম এই উভয়বিধ পদার্থই

প্রাণের ভোজন।” অন্ন বা ভোজ্যবস্তুমাত্রকে প্রাণের আধার এইরূপ এক উদার চক্ষে ঋষিরা দেখিয়া গিয়াছেন।—ভোজ্যবস্তুকে প্রাণের আধার জানিয়া কোনরূপ ভোজ্য পদার্থের নিন্দা বা অনাদর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্নকে মহান ভাবে দেখিয়া, উহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছেন—“অন্নবান্ মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ কীর্ত্ত্যা।” (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

“অন্নবান, প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ ও মহতী কীর্ত্তির দ্বারা মহান হয়েন।”

“ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ” লোকের রুচি ভিন্ন, সেই কারণে আহারও যে রুচি হিসাবে ভিন্ন হইবে তাহার কথাই নাই।

প্রাণীমাত্রেরই আহার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আমিষ ও নিরামিষ। এই দ্বিবিধ আহারের মধ্যে ধর্ম্মের চক্ষে নিকৃষ্ট আসন পায় আমিষাহার। বল-কারিতা প্রভৃতি মাংসের অনেক গুণ আছে স্বীকার

করি, কিন্তু এক যে হিংসা উহাই মাংসকে ধর্ম্মতঃ নিরামিষাহারের নিম্নে আসন দিয়াছে।

"নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ॥" (মনু)

"প্রাণীহিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হইতে পারে না; প্রাণিবধ স্বর্গের কারণ নহে, অতএব মাংস বর্জ্জন করাই শ্রেয়।" কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষি মনু একটুও আত্মার সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বিহিত স্থলে মাংসভক্ষণের ব্যবস্থাও দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত সর্ব্বশেষে উদারতা সহকারে এই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো"
"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

"মাংস ভক্ষণে দোষ নাই কারণ ইহাতে প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে নিবৃত্তিই মহাফল-জনক।"

বস্তুতঃ বৈদিক কালে ভারতে উন্নতির প্রশস্ত যুগে কোন বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা ছিল না, আহারে স্বাধীনতা

বা উদারতা ছিল, তৃপ্তিপথে কোনরূপ কণ্টক ছিল না; সে স্বাধীনতা সে তৃপ্তি আমাদের একালে এই হীনবল হিন্দুজাতির মধ্যে একান্ত দুর্লভ। দেশকালপাত্রভেদে আমিষাহারেও যেমন ঋষিদিগের অরুচি ছিল না, নিরামিষাহারেও সেইরূপ প্রাণের মহান্ তৃপ্তি ছিল। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আর্য্যজাতি চিরকাল নিরামিষপ্রধান। দয়াধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি কিছু হিংস্র স্বভাব অসুরগণের ন্যায় আমমাংসভক্ষক ছিলেন না—কাঁচা মাংস খাইতেন না। নিরামিষ আহারই তাঁহাদিগের প্রাণ, তাই ঘৃত দধি ও নানাবিধ মসলা প্রভৃতি নিরামিষ উপকরণের সাহায্যে সংস্কৃত করিয়া, আমিষের আমিষত্ব লোপ করিয়া দিয়া তবে তাহারা আমিষ আহার করিতেন — আমিষকে খাদ্যের গণ্ডীর মধ্যে আনিতেন। এই দেবপ্রাণ আর্য্যজাতির নিরামিষেই যেন সমধিক রুচি দেখা যায়।

নিরামিষ আহারই যখন আমাদের প্রাণের প্রধান সম্বল, তখন আহার করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, আহার্য্যের উপকরণগুলি কোথা

হইতে একত্র সংগ্রহ করা যায়। তাহা আর কোথাও নহে একমাত্র 'মুদীর দোকানে'। মুদীর দোকানের নাম করিলেই হয়ত বা এক্ষণে আমাকে অনেকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, তথাপি এই দেশীয় ভাবের প্রাবল্যের কালে আমার আশা আছে, সুবিবেচক ব্যক্তিরা নাসিকা কুঞ্চন করিতে বিরত হইয়া আমার কথায় মনোযোগ দিতে বিশেষ বিরক্তি বোধ করিবেন না। বিজাতীয় ভাবের প্রবলস্রোতে মুদীর দোকান এযাবৎ অনাদরে অতি দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে—সকলের উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু ইহা যে আমাদের প্রাণধারণের একমাত্র নির্ভরস্থান তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই মুদীর দোকান হইতে গৃহী, খাদ্যোপযোগী চাল, ডাল, ঘি, তৈল প্রভৃতি অধিকাংশ খাদ্যোপকরণ সঞ্চিত করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহার প্রতি প্রাণের আস্থা ও কৃতজ্ঞতা আমাদের একটুও নাই বলিলে হয়। এই মুদীর দোকানের স্থান যেন আজকাল 'Oilman's

Store অধিকার করিতে বসিয়াছে। 'মুদীর দোকান' না বলিয়া যদি 'Oilman Store' বলা যায়, অমনি হয়ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; কিন্তু 'মুদীর দোকান' এই নামে আমাদের প্রাণের আনন্দের মূল যেমন সুগভীর প্রোথিত থাকিয়া রসাকর্ষণ করিতে পারে, এমনটা কি Oilman Storeএ হইতে পারে? Oilman's Store অর্থে তৈল বিক্রয়ীর ভাণ্ডার বুঝায়—ইহা বিজাতীয় ব্যবহারিক শব্দ মাত্র—অন্তঃসারশূন্য। ইহাতে প্রাণের আকর্ষণ কোথায়? কিন্তু এই লাঞ্ছিত, আমাদিগের নিজস্ব 'মুদীর দোকান' যদিও বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, তথাপি ইহা অন্তরে অন্তরে কতদূর প্রাণের আনন্দদায়ক, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

এই মুদীর দোকান বড় আজিকালের সৃষ্টি নহে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা ভারতে বিরাজ করিতেছে—ভারতবাসীকে অধিকাংশ আহার্য্য দ্রব্য যোগাইয়া আসিতেছে। আজকালকার অবহেলার আস্পদ মুদীর দোকান আমাদিগের পূর্ব্বপূর্ব্ব পিতৃ-

পুরুষগণের প্রাণে কতনা হর্ষ কতনা আনন্দ জাগ্রত করিত!

এই যে 'মুদী' শব্দটী ইহা বড় আজকালের কথা নয়। ইহা বৈদিক কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। 'মুদী' নামটীতে ঋষিদিগের প্রাণের হর্ষ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। 'মুদী' নামের ধাত্বর্থ হর্ষ; হর্ষ বা প্রাণের আনন্দজ্ঞাপক 'মুদ্' ধাতু হইতে 'মুদী' শব্দের উৎপত্তি। "মুৎপ্রীতিঃ প্রমদো হর্ষঃ" (অমর কোষ)। যখন শস্যশ্যামল ভারতে পরিপক্ক ধান্য গোধূমাদি অন্নসমূহ ভরিয়া উঠিত—যখন অন্নপূর্ণা গৌরীর ন্যায় তাহার মুখে শোভনা শ্রী বিরাজ করিত, তখন ঋষিদিগের প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগরুক না হইয়া যাইতে পারিত না। তাই বৈদিক ঋষিরা এই হর্ষদ্যোতক 'মুদ' শব্দেই ব্রীহ্যাদি অন্নমাত্রকেই বুঝাইতেন। চাল, ডাল, গোধূম প্রভৃতি অন্ন বা ওষধির সাধারণ বৈদিক নাম 'মুদ'। বিবাহকালে বৈদিক রাষ্ট্রভৃদ্ধোমে যে দ্বাদশ মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে তাহার মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে ওষধি বা ব্রীহ্যাদি অন্ন

অর্থে 'মুদঃ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "ততো রাষ্ট্রভৃদ্ধোমে পারস্করঃ—'বিবাহে রাষ্ট্রভৃদিচ্ছন্নিতি।" তত্র দ্বাদশ মন্ত্রা যথা—এই দ্বাদশমন্ত্রের দ্বিতীয় মন্ত্রটী এই ঃ—

"ঋতাষাড়্তধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো

মুদোনাম তাভ্যঃ স্বাহা।"

অস্যার্থ ঃ—যোঽগ্নিঃ গন্ধর্ব্বরূপঃ। কিম্ভূতোঽগ্নি ঋতং সত্যং সহতে ইতি ঋতাসাট্ সত্যসহকৃত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ঋতধামা ঋতং ধাম স্থানং যস্যেতি ঋতধামা। তস্য অগ্নের্গন্ধর্ব্বরূপস্যাপ্সরসঃ ওষধয়ো ব্রীহ্যাদয়ঃ। কিম্ভূতাঃ মুদোনাম মুন্নাম্ন ইত্যর্থঃ। তাভিঃ সর্ব্বে মোদন্তে ইতি মুদঃ তাভ্য ওষধিভ্যঃ স্বাহা স্বহুতমস্তু। অগ্নের্গন্ধর্ব্বস্যাপ্সরোভ্যো মুন্নাম্নীভ্য ওষধিভ্যঃ অস্মাভিরিদমাজ্যং প্রদত্তং তা অস্মাকং জ্ঞানং বীর্য্যঞ্চ রক্ষন্ত্বিতি বাক্যার্থঃ।

"ঋতসহকারী ঋতধাম গন্ধর্ব্বরূপ যে অগ্নি, ওষধি বা ব্রীহ্যাদি অন্নগণই তাহার অপ্সরাগণ। সেই মুদো-নাম্নী অপ্সরাগণের উদ্দেশে এই হবি আহুতি প্রদত্ত হইল। ইহা আমাদিগের জ্ঞান ও বীর্য্য রক্ষা করুক।"

চাল, ডাল, গোধূম প্রভৃতি ওষধি বা অন্নসমুহকে 'মুদঃ' কেন বলে টীকাকার তাহা স্পষ্টই ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন—"তাভিঃ সর্ব্বে মোদন্তে ইতি মুদঃ।" অর্থাৎ "এই অন্নের দ্বারা সকলে হর্ষ বা তৃপ্তি লাভ করে তাই 'মুদঃ' নাম।" দক্ষিণায়নের কাল বা হেমন্তঋতু, ধান্যাদি অন্নের প্রশস্তকাল বলিয়া তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দক্ষিণায়ন কালকে এ পর্য্যন্ত 'মোদঃ' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন,—

"মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ"

পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিলেন যে বৈদিক, ঋষিরা ধান্যাদি ওষধির হর্ষে প্রমুদিত হইয়াই ধান্য গোধূমাদি অন্নের নাম দিয়াছেন 'মুদঃ'। এই 'মুদ' বা অন্ন যাহার গৃহে বা যাহার পণ্যশালায় আছে সেই "মুদী"। মুদোঽন্নমস্যাস্তীতি মুদী। এইরূপে অন্ন-বিক্রয়কারীর নাম 'মুদী' হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম 'মুদী' বলিলে আজকাল যেরূপ তুচ্ছভাব, অপদার্থ হেয়ভাব প্রাণে জাগ্রত করে উহা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ হেয় বা অবজ্ঞার আস্পদ নহে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের প্রাণের চির-আনন্দ

এই 'মুদী' নামে বিজড়িত; অথচ পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে এমন আনন্দদায়ক মনোরম নামটীর প্রতি আমরা একবার দৃক্‌পাত না করিয়া ঘৃণার ভাবে দেখিয়া থাকি। এমন প্রাণের বস্তু 'মুদী'কে ছাড়িয়া নীরস 'Oilman'কে যে কি প্রকারে ভাল লাগে তাহা বলিতে পারি না। যাঁহার প্রাণ আছে হৃদয় আছে তিনি অবশ্যই ঋষি উচ্চারিত এই 'মুদী' নামে পূর্ণ হর্ষলাভ করিবেন।

মুদীর দোকানের প্রধান প্রধান সামগ্রীগুলিরও নাম এই হর্যদ্যোতক 'মুদ্' ধাতু হইতেই উৎপন্ন। দেখুন ঘৃত একটী মুদীর দোকানের প্রধান দ্রব্য। খাদ্যপাকে এই ঘৃতের অন্যতম নাম 'ময়ান'। এই 'ময়ান' সংস্কৃত 'মোদন' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মোদনকারী বা হর্ষ-জনক বলিয়াই ঘৃতের নাম 'মোদন'। যেমন 'বদন' হইতে বাঙ্গলায় 'বয়ান' আসিয়াছে সেইরূপ "মোদন" হইতেই 'ময়ানের' উৎপত্তি। যখন রুটী লুচি বা অন্য কোন পিষ্টকজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা যায়, তখন ঘৃত সম্পর্ক ভিন্ন তাহা বস্তুতঃ মোদনকারী হয় না। ঘৃত

বিহীন পিষ্টকাদি দ্রব্য শুষ্ক ও নীরস হইয়া থাকে। তাই রুটী লুচি প্রভৃতিকে মোদনকারী করিবার জন্য ঘৃত 'ময়ান' দেওয়া হয়। যেমন ঘৃত মোদনকারী দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘৃতের অন্যতম নাম মোদন বা ময়ান হইয়াছে, সেইরূপ যে সামগ্রীটি প্রধানতঃ ঘৃতের দ্বারা মোদনীয় তাহারও নাম "মোদ্য" হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত 'ময়দা' শব্দটী সংস্কৃত 'মোদ্য' শব্দ হইতে প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। 'মোদ্য' অর্থাৎ যাহা ঘৃতের দ্বারা মোদনীয় অর্থাৎ যাহাতে ঘৃতের ময়ান মাখান হয়। এই 'মোদ্য' শব্দটী লোকমুখে একটু বিকৃত হইয়া 'ময়দা' আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কি হিন্দু-স্থানে কি বঙ্গে সর্ব্বত্রই এই কারণে গোধুমচূর্ণ ময়দা নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ গোধুমচূর্ণ ময়দার সহিত ঘৃতের যেরূপ প্রগাঢ় সখ্য, এমন আর অন্য কিছুর সঙ্গে নহে। ভক্ত বা ভাত এবং ডাল ও তরীতরকারী প্রভৃতি ঘৃতের সাহায্য বিনাও খাওয়া যায়, কিন্তু ময়দা ঘৃত সাহায্য বিনা খাওয়া চলে না। ঘৃতাক্ত হইয়া তবে ময়দা সকলকে প্রমুদিত বা হর্ষান্বিত করে; কি

গজা প্রভৃতি পিষ্টক, কি রুটী, কি লুচি সকল প্রকার খাদ্যেই ময়দা ঘৃত সাহায্যেই নিজ গুণের পরিচয় দিয়া থাকে। অনেক স্থলে গোধূম-চূর্ণ 'আটা' নামেও অভি-হিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু 'আটা' শব্দে কেবল যে গোধূমচূর্ণকে বুঝায় তাহা নয়, গোধূমের ন্যায় অন্যান্য দ্রব্যের চূর্ণকেও 'আটা' বলে। যথা, 'ভুট্টার আটা,' 'যবের আটা' ইত্যাদি; হিন্দুস্থানী পাচকেরা "উরদ্‌কি ডালকা আটা", "মুগকা চূর্ণ বা মুগকা আটা", "গেঁহুকা আটা" ইত্যাদি বলিয়া থাকে। উহারা কোন দ্রব্যের চূর্ণকে সচরাচর 'আটা' বলে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে চাল, গোধুম প্রভৃতি শস্যচূর্ণের নামই 'আটা'। 'আটা' শব্দের উৎপত্তি 'আবৃত্ত' বা 'আবর্ত্তিত' শব্দ হইতেই হওয়া সম্ভব। যাহা 'যন্ত্রাবর্ত্তিত' অর্থাৎ চাক্কি বা যাঁতায় পেষিত হয় তাহাই 'আটা'। ধান্য প্রভৃতি যাহা যাঁতায় আবর্ত্তিত হইয়া চূর্ণ হয় তাহাই আটা, তাই বলিয়া ইষ্টকের চূর্ণ যাহা যাঁতায় আবর্ত্তিত হয় না তাহাকে 'আটা' বলে না। খাদ্যপাকে যখন দেখি সংস্কৃত 'আবর্ত্তন' শব্দ বঙ্গপ্রাকৃতে 'আওটান' শব্দে

পরিণত হইয়াছে, তখন 'আবৃত্ত' বা 'আবর্ত্তিত' হইতে যে 'আটা' আসিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আবার দেখুন 'বৈদল' বা ডাল জাতীয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, রসনার বিশেষ তৃপ্তিজনক সেই মুগের ডালও এই 'মুদ্' ধাতুকে নিজ অঙ্গীভূত না করিয়া যায় নাই। মুগের ডালের সংস্কৃত নাম 'মুদ্গ'। 'মুদ্গ শব্দের অর্থ যাহা 'মুদ বা হর্ষকে প্রাপ্তি করায়'। বৈদিক কালে মুদ্গ বা মুগের ডাল ঋষিদিগের এত অধিক প্রিয় বস্তু ছিল যে অনেক ঋষি "মুদ্গ ভক্ষণকারী" এই নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে অনেকের নাম যে 'মুদ্গল' দেখিতে পাওয়া যায়, নিরুক্তকারের মতে উহা 'মুদ্গগিল' অর্থাৎ মুগ-ভক্ষক শব্দের সংক্ষেপ মাত্র।

যেস্থলে হর্ষে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা হয়—প্রাণ জুড়ান তৃপ্তি উপভোগ করা যায়, সেই স্থলেই যেন হর্ষ-দ্যোতক 'মুদ' শব্দ আপনাআপনি প্রাণ হইতে উত্থিত হয়। নয়নানন্দকারী শস্যশ্যামল ক্ষেত্র দেখিলে কাহার না প্রাণ জুড়ায়? তাই তাহা 'মোদোদ্যান' বা 'ময়দান' নামে অভিহিত। কি খাদ্য কি ঔষধ কি অন্যান্য বিষয়

যেখানে ঋষিরা প্রাণজুড়ান হর্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই খানেই 'মুদ বা 'মোদ' শব্দের ব্যবহার না করিয়া তৃপ্ত হন নাই। সুমিষ্ট লড্ডূক মোদনকারী, তাই তাহার নাম হইল 'মোদক'। আমাদের 'মোয়া" যেমন 'খইয়ের মোয়া' এই 'মোদক' শব্দ হইতেই উৎপন্ন। ঔষধের মধ্যে যাহা মিষ্ট তাহাও 'মোদক' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 'মোদককার' হইতে বাঙ্গলায় 'ময়রা' আসিয়াছে। সুমিষ্ট জমাট ক্ষীর যাহা একরূপ মোদকেরই তুল্য তাহারও নাম 'মেওয়া'—ইহাও 'মোদক' শব্দজাত। বাদাম পেস্তা প্রভৃতি মোদনকারী ফলেরও নাম 'মেওয়া'। বস্তুতঃ বাদাম পেস্তা প্রভৃতি ফলগুলি অধিকাংশ খাদ্য-দ্রব্যের মোদনার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনেক খাদ্যের সঙ্গে সহকারীরূপে থাকিয়া তাহাদের সোহাগ বা উৎকর্ষ সাধন করে।

উপরে যে সকল মোদনকারী দ্রব্যাদির নাম করিলাম সেইগুলি এবং তাহাদেরই স্বজাতীয় অন্যান্য নানা দ্রব্য-সমূহ মুদীর দোকানের উপকরণ সামগ্রী। এই সকল ভারত-প্রসূত দ্রব্যসমূহ মুদীর বিপণি হইতেই এককালে

দেশবিদেশে পরিচালিত হইত; শস্যশ্যামল ভারতের বিপণি হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি নানা দ্রব্য দেশবিদেশে নীত হইত। এখনও তাহার চিহ্ন দেশবিদেশে পাওয়া যায়; তাই এখনও দেখা যায়, আমাদের দেশ হইতে সেই সকল দ্রব্য বিদেশে গিয়া তাহাদের ভাষার মধ্যে নিজনাম অঙ্কিত করিয়া আসিয়াছে। যেমন ধান বা চাল ইহা মুদীর প্রধান আসবাব। ধান্যের মাহাত্ম্য জগতে কাহারও অবিদিত নাই; সমগ্র আসিয়াখণ্ডে ইহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। কিছুদিন হইল কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ধান্যের নাম 'আটিয়া' (Atia) হইতে 'আসিয়া' নামের উৎপত্তি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। য়ুরোপ ও আসিয়া ভূখণ্ডের অধিকাংশ ভাষায় ধান্যের নামগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন দেখা যায়। ভারতের বৈদিক শব্দই দেশবিদেশের চালের নাম সরবরাহ করিয়াছে। ধান চালের নাম ও উহার আদর য়ুরোপীয়েরা যে ভারতের নিকট শিক্ষা করিয়াছে, তাহা উহারা নিজেরাই যখন স্বীকার করে, তজ্জন্য আমাদের সে কথা লইয়া

মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী 'চাল' প্রবন্ধে ধান চাল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করায় এ প্রবন্ধে সে বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিতে নিরস্ত হইলাম।

চাল, ডাল, ঘৃত তৈল প্রভৃতি নিরামিষ মোদনকারী দ্রব্যেই আমাদের মুদীর দোকান সুসজ্জিত থাকিত, আর এক্ষণে Oilman Storeএ ঐ সকল দ্রব্য অল্পই সঞ্চিত থাকে; কিন্তু ভারে ভারে বিদেশানীত আমিষ-দ্রব্য এমন কি অমেধ্য ঘোটকাদি অখাদ্য মাংস প্রভৃতিও টিনবদ্ধ হইয়া আমাদের দেশকে প্লাবিত করিতেছে। যে স্থলে মুদীর বিপণিতে বিশুদ্ধ পরিতৃপ্তি উপভোগ্য ছিল, এক্ষণে তাহার স্থলে Oilman Store এর অপরিতৃপ্ত হিংসাসুখ-মত্ততা আসিয়া রাজত্ব করিতে চাহিতেছে। বস্তুতঃ, দেহের বলমাংসকর হইলেও হিংসালব্ধ আমিষাহারে সে হর্ষ সে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, যেমন পবিত্র নিরামিষ আহারে পাওয়া যায়; অথচ আমিষাহারের ন্যায় নিরামিষ দ্রব্য কিছু কম বলপুষ্টিকর নহে। কিন্তু

নিরামিষ দ্রব্যের চারিদিকে আনন্দ বার্ত্তা! সেই আনন্দ সেই আমোদ ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজ করুক —মুদীর বিপণিতে ভারতের অন্ন ভারতবাসীরা অক্লেশে লাভ করিয়া জ্ঞানে বীর্য্যে প্রমুদিত হউন।*

* এই প্রবন্ধ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে—সন ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসের "পুণ্য" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়।

চাল

—*—

চাল জিনিষটা যেমন বাঙ্গালার নিজস্ব, এমন আর কোন কিছুই নহে। বাঙ্গালী জাতি 'গেঁহু' বা ডাল-রুটীর ভক্ত নয়, কিন্তু চাল-ডালের ভক্ত। বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান খাদ্য হচ্ছে চাল। সমগ্র আসিয়ায় বোধ করি বাঙ্গলার চালের মত চাল আর কোথাও হয় না। In India generally, rice is produced in every variety of soil at every altitude and in every latitude. * * * The finest is the Bengal table rice. * বাঙ্গালার চালের যত নাম আছে, সব সংগ্রহ করিলে একটা বই হ'তে পারে। এক চাল থেকে বাঙ্গলাদেশে কত রকমের খাদ্য সামগ্রী না প্রস্তুত হয়!

* Encylopaedia India.

চাল থেকে ভাত, পোলাও, খিচুড়ী, পায়স, মুড়িমুড়কি, চিড়া, খই, নবান্ন, পৌষপার্ব্বণের নানারকম পিঠে, আর কত নাম করিব, এই সকলই তৈয়ারী হয়,—ইহা ছাড়া মালপোয়া, মেঠাই, রসগোল্লা আদি নানা মিষ্টান্নে চালের সহযোগিতা চাই। চাল-ধোয়া জল ও চালের মণ্ড আদি চিকিৎসায়ও অনেক কাজে লাগে। শরতে যখন ধানের অঙ্কুর হবার সময় আসে, তখনই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণার পূজা হয়। আবার যখন শারদ ধান্যের নূতন উদ্গম হয়, তখন সর্ব্বত্র নবান্নোৎসবের ধূম পড়ে। সমস্ত পৌষ-মাসের যে পিঠে-পার্ব্বণের উৎসব, তাহা ঐ নূতন চালের আনন্দোৎসব ভিন্ন আর কিছু নয়।

বাঙ্গলার প্রধান খাদ্য-সামগ্রী চাল যেমন না হ'লে বাঙ্গালীর জীবন অচল হ'য়ে পড়ে, তেমনই 'চাল' শব্দেরও বাঙ্গলা ভাষায় এত বিবিধ প্রকারে ব্যবহার যে, 'চাল'কে বাদ দিলে বাঙ্গালীর 'বোলচাল' যেন নির্জীব হবার উপক্রম হয়। 'চাল' শব্দের এত রকমের বাঙ্গালাভাষায় প্রয়োগ যে, বাঙ্গলা দেশে যেমন চাল উৎপন্ন না হ'লে দুর্ভিক্ষের অবস্থা আসে, সেইরূপ বাঙ্গলা

ভাষা থেকে যদি 'চাল' শব্দকে হরণ করা যায়, ত মনে হয়, বঙ্গ-ভাষায়ও ভাব-প্রকাশের দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হবে। বস্তুতঃ নানা ভাব-ব্যঞ্জক এক 'চাল' শব্দ কত রকমে না বঙ্গ-ভাষাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে!

সংস্কৃত 'চল' ধাতু যদিও 'চাল' শব্দের মূলে, কিন্তু 'চাল' শব্দটি বাঙ্গলা ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'চাল' প্রাচীন সংস্কৃত 'তণ্ডুল' শব্দ থেকে উৎপন্ন; কিন্তু ইহা কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়— "তণ্ডুল" থেকে ঐরূপ ভাবে 'চাল' শব্দ আসা সম্ভব নয়। তাঁহাদের মতে—"যখন আতপ চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে "তণ্ডুল" হইতে তাঁড়ুল আসিয়াছে, 'তাঁড়ুল' হইতে 'তাউল' আসিয়াছে, 'তাউল' হইতে "চাউল" আসিয়াছে।"* 'তণ্ডুল' যে প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোভিল-কৃত বৈদিক গৃহ্যসূত্রে যেখানে চরু পাক করার বিধান লেখা

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৪ সাল, চতুর্থ ভাগ, চতু সংখ্যা দেখ।

আছে, সেখানে 'তণ্ডুল' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"স্থালী পাকাবৃতা তণ্ডুলানুপস্কৃত্য চরুং শ্রপয়তি।"

"এইরূপে প্রস্তুত তণ্ডুল হইতে চরু বা পায়স
পাক করা হয়।"

(গোভিল গৃঃ সূত্র)

এমন কি, সুশ্রুতে তণ্ডুলের গুণাগুণ পর্য্যন্ত লেখা আছে—

"সুদুর্জ্জরঃ স্বাদুরসো বৃংহনস্তণ্ডুলো নবঃ।"

(সুশ্রুত-সংহিতা)

অর্থাৎ "নূতন চাল খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু অতি কষ্টে জীর্ণ হয়, এবং জীর্ণ করিতে পারিলে উহা খুব পুষ্টি-কারক।"

ধান্য হইতে যে কিরূপে তণ্ডুল বা চাল বাহির করা হইত বৈদিক গৃহ্যসূত্রে তাহারও বিধান লেখা আছে।

'পশ্চাদগ্নেরুলূখলং দৃংহয়িত্বা সকৃৎসংগৃহীতং ব্রীহি-মুষ্টিমবহন্তি সব্যোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং।'

"অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে দৃঢ়রূপে উদূখল স্থাপন করিয়া তাহাতে একবারেই কয়েক মুষ্টি পরিমাণ ধান্য লইয়া উভয় হস্তে মুষল ধরিয়া ধান্যাবঘাত করিবে অর্থাৎ ধান ভানিবে।"*

যদা বিতুষাঃ স্যুঃ সকৃদেব সুফলীকৃতান্ কুর্ব্বীত।

"পূর্ব্ববিহিত অবঘাতের দ্বারা যখন ধান্যগুলি তুষ-সম্বন্ধ শূন্য হইবে, তখন শূর্পাদির দ্বারা ঝাড়িয়া সেই তুষগুলি উড়াইয়া দিবে† (এইরূপে তণ্ডুল প্রস্তুত হইল।")

সংস্কৃত চালকে যে কেন 'তণ্ডুল' বলিত, তাহার কারণ এই—'তণ্ড' ধাতুর অর্থ আঘাত করা, আবার নৃত্য করাও বুঝায়। নৃত্যার্থবাচক 'তাণ্ডব' শব্দও এই 'তণ্ড'

---

* সংস্কৃত 'অবহনন' শব্দ থেকে 'ভানা' শব্দ আসিয়াছে—'ভঙ্গ' বা 'ভাঙ্গা' থেকে 'ভানা" আসে নাই।

† তেনাবঘাতেন যদা তে ধান্যসংঘাতাঃ বিতুষাঃ বিগততুষাঃ স্যুঃ তদা সকৃদেব একবারেণৈব তান্ অবহতধান্যসমূহান সুফলীকৃতান্ শূর্পাদিনা তুষান্ পৃথককৃত্য তণ্ডুলরূপান্ কুর্ব্বীত। (গোভিল গৃহ্য-সূত্রের সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত টীকা।)

ধাতু থেকে উৎপন্ন। নৃত্যকারী খঞ্জন পাখীর আর এক নাম 'তণ্ডক'। পুরাকালে ধান থেকে চাল বাহির করিবার সময় যখন উদূখলে মুষল দ্বারা আঘাত করা হইত, তখন চালগুলি মুহুর্মুহুঃ নৃত্য করিয়া উঠিত, তাই দেখিয়া সংস্কৃতে চালের নাম "তণ্ডুল" রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই 'চাল' নামের সঙ্গে 'তণ্ডুল' নামের সম্পর্ক নাই। চালের নৃত্যের প্রতি ততটা দৃকপাত না করিয়া, উহার প্রকরণের উপর আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই লোক-প্রিয় খাদ্যের নাম রাখা হইয়াছে 'চাল'। আমরা বাঙ্গলায় শুদ্ধ ভাষায় সচরাচর লিখে থাকি 'চাউল' 'দাইল' ইত্যাদি। এইরূপ লেখার কোন প্রয়োজন দেখি না—মধ্যের উকারের ও ইকারের আমদানী নিরর্থক। পশ্চিমারা শব্দের উচ্চারণে টান দিতে ভালবাসে বলিয়া 'চাল' না বলিয়া 'চাওল' বলিয়া থাকে।

'চাল' শব্দের আসলে উৎপত্তি। 'চালন' বা 'চেলে লওয়া' থেকে। ধানকে তুষবর্জ্জিত করিবার জন্য স্থূর্প বা চালনীতে চেলে লওয়া হয় বলিয়া উহার নাম

'চাল'। খোসা-সমেত যাহা, তাহা 'ধান'—খোসা বা তুষবর্জ্জিত ধান্যের যে সারভাগ, তাহারই নাম 'চাল'। এই কারণে শুধু যে ধানের সারভাগকে 'চাল' বলে, তাহা নয়; ধান ছাড়া অন্য কোন কোন সামগ্রীরও খোসা-বর্জ্জিত সারাংশকে বাঙ্গলায় 'চাল' বলা হইয়া থাকে; যেমন "ধনের চাল" ইত্যাদি। যখন ধনের খোসা পরিবর্জ্জনের জন্য চেলে লওয়া হয়, তখন তাহাকেও 'ধনের চাল' বলে।

বাঙ্গালা ভাষায় 'চাল' শব্দ যে চেলে লওয়া থাকে হইয়াছে, তাহা আরও অন্যান্য উদাহরণ দ্বারা প্রতি-করা যায়। "ঘরের চাল" কেন বলে?—খোড়ো ঘরের ছাদকেই 'চাল' বলা হয়—কোঠাবাড়ীর ছাদকে ত চাল বলে না—'ছাদ' বলা হইয়া থাকে। খোড়ো ঘরের ছাদ তৈয়ারীর সময় খড়গুলো চেলে চেলে বিছিয়ে দেওয়া হয় বলিয়াই খড়ের 'চাল' বলে। খোড়ো ঘরের এক নামই ত 'আটচালা।' খড়কে 'বিচালি' বলা হয় কেন না, 'বি' অর্থাৎ বিশেষ রকমে চেলে লওয়া হয় বলে'। এই কারণে আবার

একটা কাঠকে টুকরা টুকরা ক'রে চেলে নিলে তাহাকে আমরা 'চালা কাঠ' বলি।

এই এক 'চাল' শব্দ থেকে বাঙ্গালা ভাষায় যে কত ভাবের অভিব্যক্তি হ'য়েছে পাঠকগণের গোচরার্থে কতকগুলি উদাহরণ দ্বারা নিম্নে তাহা দেখান হ'ল—

বাঙ্গালীর আহারে বিহারে চাল, যথা—'অমুকের চাল বড় খারাপ", "চালচুলো", "চাল-চলন, "বেচাল", "চাল মারা" "চালবাজী" "চাল দেখানো" ইত্যাদি। এইরূপ কত ভাবেই যে এই এক 'চাল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালীর খেলাতেও চাল, যথা—'দাবার চাল' 'বড়ের চাল' ইত্যাদি। আমাদের রাজনীতিতে 'চাল'-এর প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়, যথা—"খুব ভাল চাল চেলেছে", "diplomatic চাল" ইত্যাদি। সময়ে সময়ে ওজনেও চাল শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—'এক চাল ভর জাফরান'। চতুর লোককে যে আমরা 'চালাক' বলি এবং কাহারও সঙ্গে রহস্য করিলে যে 'চালাকি করা' বলে থাকি, এই শব্দ-দ্বয়ের সঙ্গে 'চাল' এর ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভব।

'চাল' থেকে বঙ্গভাষায় আর একটি কথা এসেছে, যাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দুর্গা-প্রতিমার পৃষ্ঠভাগে যে "চালচিত্র" করা হয়, তাহাকে "চালচিত্র" বলে কেন? হিমালয় অঞ্চলে ভুটিয়া প্রভৃতি পাহাড়ী মেয়েরা প্রকৃতই দেখা যায় দুর্গা-পূজার সময় চাল দিয়া ললাট প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া থাকে। পুরাকালে খুব সম্ভবতঃ হিমালয়-কন্যা অন্নপূর্ণাকে প্রকৃতই হিমালয়-বাসী মেয়েদের মত চাল দিয়া চিত্রিত করা হইত— এখন আর সে প্রথা নাই; সার জিনিষ চালের পরি-বর্ত্তে চাক্‌চিক্যশালিনী রাংতা চালচিত্রে শোভা পাইয়া থাকে। আজকালকার প্রসাধনে মেয়েদের মধ্যে যে পাউডার মাখা খুব চলিয়াছে—উহারও অন্যতম প্রধান উপকরণ চালের গুঁড়ো—পাউডার মাখাকে নব্যযুগের 'চালচিত্র' বলা যাইতে পারে।

এইবার দেখা যাক চালের ইংরাজী নাম 'rice' কোথা হইতে আসিল। য়ুরোপের অধিকাংশ ভাষাতেই চালের নামটা rice না হ'লেও প্রায় তদনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা জার্ম্মাণ ভাষায় 'ries', ফরাসী ভাষায়

'riz', ইটালিয় ভাষায় 'riso', গ্রীক ভাষায় 'অরিসা' ইত্যাদি। যখন এই সব নানা ভাষায় চাল অর্থবাচক শব্দগুলি শুনিতে প্রায় একই ধরণের, তখন নিশ্চয়ই ইহার গোড়া যে কোন একটি আদি ভাষার মধ্যে নিহিত তাহাতে ভুল নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সকলেই মানেন যে, ভারতবর্ষ থেকে পারস্য অতিক্রম করিয়া এই চালের নামগুলি য়ুরোপে উপনীত হইয়াছে। চালের আদি স্থান এই ভারতবর্ষ হইতে কোন একটা শব্দ কোন্ যুগে ঐ সকল দেশে উপনীত হইলে, উহার আকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মাত্র। সেই আদি শব্দ বৈদিক ধান্য-বাচক "ব্রীহি" শব্দ। 'ব্রীহির' 'হ' 'স' র মত * উচ্চারিত হইলে এবং আদ্যক্ষর 'ব' র লোপ হইলে, "রীসি"তে পরিণত হয়; "রিসি" থেকে এইরূপে ক্রমে rice (রাইস) আদি শব্দের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। পারস্য

---

*কোন একটী শব্দ এক ভাষা থেকে ভাষান্তরে গেলে 'হ' অক্ষর 'স'তে কিম্বা 'স' 'হ'তে পরিণত হয়; তাহার নিদর্শনের অভাব নাই—যেমন, 'হপ্তা' সংস্কৃতে 'সপ্তাহ' ইত্যাদি।

ভাষায় চালকে 'Birinch' বলে—'Birinch' এর সহিতও সংস্কৃত "ব্রীহির" খুব সাদৃশ্য।

বাঙ্গলা দেশে চালের এত আদর কেন?—চাল থেকে যে ভাত হয়, তাহা বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য বলিয়া। ভাতের সংস্কৃত নাম 'ভক্ত'—

"ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যম্"। †

বোধ হয়, পশ্চিমাদের আটার ন্যায় "ভাত" অত রজোগুণবর্দ্ধক নয়। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ভক্ত লোকদের খাদ্য বলিয়াই হউক, অথবা সকলেই ইহার ভক্ত কিম্বা সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া, ইহার 'ভক্ত' নাম হইয়া থাকিবে। লাটিন Victus শব্দ যাহার অর্থ খাদ্য, এবং ইংরাজী Victual শব্দ—সংস্কৃত এই 'ভক্ত" শব্দ থেকেই তাহাদের উৎপত্তি মনে হয়।

খুব প্রাচীনকালে প্রাণধারক খাদ্যদ্রব্যমাত্রকেই 'অন্ন' বলিত। তাই বেদবচনে দেখা যায়—

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ অন্নং বৈ প্রাণং"।

† ভাব-প্রকাশ।

বৈদিক যুগে 'অন্ন' বলিতে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি আটাশ রকমের খাদ্য দ্রব্য বুঝাইত।

"অষ্টাবিংশতিরন্নম্" *

মহাভারতে গয়রাজর্ষির যজ্ঞে যে অন্নকুট বা অন্ন-গিরির কথা আছে, তাহা কেবলমাত্র স্তূপাকার ভাত নয়, এ স্থলে অন্ন বলিতে পুঞ্জীভূত নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রীর কথা জ্ঞাপন করিতেছে। † কিন্তু ক্রমে 'ভাত' বা 'ভক্ত' ভারতবাসীর এত প্রিয়খাদ্য হইয়া উঠল যে, 'অন্ন' বলিতে একমাত্র ভাতকেই বুঝাইতে লাগিল—

"ভক্তমন্ধোহন্নমোদনো"

(অমর-কোষ)

অমরকোষের আমলে 'ভক্ত' ও 'অন্ন' একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আজকাল য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশে ভারতের ন্যায় চাল একটি প্রধান খাদ্যরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমেরিকার **Carolina rice**এর

* বৈদিক নির্ঘণ্টূ পূর্ব্বাষ্টক ৩য় অধ্যায়।

† মহাভারত বনপর্ব্ব।

সুখ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। আমাদের "ভেতো বাঙ্গালী" বলে বলুক, কিন্তু আজকাল ইংরাজদের খানায় নিত্য "কারীভাত" না হইলে চলে না। অথচ ইংরাজরা কিছু কাল পূর্ব্বে চাল সম্বন্ধ এতটা অনভিজ্ঞ ছিল যে, কোম্পানীর আমলে যখন 'বড় সাহেব' তাঁহার আফিসের 'বড় বাবুকে' জিজ্ঞাসা করেন, rice বা চাল কি করে' তৈয়ারী হয়—বড় বাবু তখন বেশ জবাব দিয়াছিলেন—

"Two man ধাপুস ধুপুস
One man সেঁকে দেয়
তবে সাহেব rice হয়"

অর্থাৎ "প্রথমে দুজনে ঢেঁকীতে ধাপুস ধুপুস করে' ধান কুটে দেয়, তাহার পর এক জন সেঁকে দেয়, তবে চাল তৈয়ারী হয়।" *

* সন ১৩৩১ সালে আশ্বিন সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা মুদীর দোকানের দ্বিতীয় সংস্করণে যোজিত করা হইল—প্রথম সংস্করণে এ প্রবন্ধ ছিল না।

বসুমতীতে এই প্রবন্ধের শেষভাগে এইটুকু লেখা ছিল—"শারদোৎসবে অন্নপূর্ণার পূজায় চালের নৈবেদ্য দেওয়া হিন্দুদের প্রথা—আজ তাই পূজার মাসিকে এই 'চাল' প্রবন্ধ নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিলাম।" 'চাল' প্রবন্ধ গ্রন্থে নিবদ্ধ হইল বলিয়া ঐ অংশটুকু বর্জ্জন করা হইল

আইবুড়ভাত ও বউভাত *

কিছুকাল হইতে দেখিতেছি "আয়ুর্ব্বর্দ্ধ্যন্ন" শব্দ কেমন নিঃশব্দে বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়া সংস্কৃতের মুখোষ ধারণ পূর্ব্বক "আইবড়ভাত" এর পিতৃপদ অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছে! যে পণ্ডিতবর প্রথম এই শব্দকে বঙ্গভাষায় প্রবেশের পথ প্রদর্শন করেন, অবশ্য তাঁহার সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু মুখোষটী খুলিলেই উহা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা সহজেই ধরা পড়ে। তিনি মনে করিয়াছেন যে, "আয়ু" শব্দের অপভ্রংশ 'আই', বৃদ্ধি শব্দের অপভ্রংশ বুড় বা বড় এবং 'অন্ন' শব্দের প্রাকৃত শব্দ ভাত। এইরূপ গবেষণার সাহায্যে তিনি "আইবুড়ভাতের'

* ১৩১০ সাল আশ্বিন সংখ্যার 'পুণ্যে' প্রকাশিত হয়

সংস্কৃত "আয়ূর্ব্ব দ্ধান্ন" প্রচার করিয়া থাকিবেন। "আয়ূর্ব্বদ্ধ্যন্ন" কথাটী ভ্রমপ্রসূত হইলেও শুনিতে সুমিষ্ট এবং বরকন্যার আশীর্ব্বাদ-সূচক আয়ূর্ব্বদ্ধি-কামনাপূর্ণ বলিয়া ইহা কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং "আইবুড়ভাতের" প্রকৃত সংস্কৃত শব্দরূপে সমাজে গৃহীত হইতে চলিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি "আইবুড়ভাতের" পরিবর্ত্তে এই "আয়ুর্ব্বদ্ধ্যন্ন" শব্দটি বিবাহের সকল মুদ্রিত কার্ড এবং স্মারকলিপিমাত্রে এবং এমন কি প্রধান প্রধান পঞ্জিকায় পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। *

"আইবড়ভাত" কিন্তু "আয়ুর্ব্বদ্ধ্যন্ন" শব্দের প্রকৃত অপভ্রংশ নয়—"আইবুড়" বা "আইবড়" শব্দ "অবি-

* এই প্রবন্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হবার অনেক পরে ১৩১৫ সালের পি, এম, বাগচির ন্যায় দুএকটী প্রসিদ্ধ পঞ্জিকায় 'আয়ুর্ব্বদ্ধ্যন্ন'র পরিবর্ত্তে 'অবূঢ়ান্ন' লেখা সুরু করিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। অন্যান্য পঞ্জিকার ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে এই প্রবন্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, সে সময়ে সকল পঞ্জিকা ও বিবাহের নিমন্ত্রণলিপি মাত্রেই "আয়ুর্ব্বদ্ধ্যন্ন" শব্দ লিখিত হইত।

বাহিত” শব্দের অপভ্রংশ। অথবা উহার সমানার্থ-বাচক “অব্যূঢ়” শব্দের অপভ্রংশ হইলেও হইতে পারে। এবং ‘ভাত’ সংস্কৃত ‘ভক্ত’ শব্দের অপভ্রংশ। বস্তুতঃ “অবিবাহিতভক্ত” হইতেই “আইবুড়ভাতের” উৎপত্তি। *

“অবিবাহিত” ও ‘অব্যূঢ়’ ইহারা জ্ঞাতি শব্দ; ইহাদিগের অর্থও যেমন একই, তেমনি ইহাদিগের মূল ধাতুও এক ‘বহ’ ধাতু। বিবাহিত শব্দের অর্থও যেমন ‘কৃতোদ্বাহ’, ‘ব্যূঢ়’ শব্দের অর্থও তাহাই। আসল কথা “অতিবাহিতভক্ত” এত বড় যে কথা, উহা উচ্চারণ করা সহজ নয়; তাই স্বল্প পরিসর অব্যূঢ়ান্ন” শব্দটা লোক-মুখে আদৃত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু আসলে ‘আইবড়’র প্রকৃত মূলশব্দ ”অবিবাহিত”, “আইবড়” যে কিরূপে “অবিবাহিত” শব্দের অপভ্রংশে পরিণত হইল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। ভাষাতত্ত্বের নিয়ম আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, কোন একটী শব্দের ‘হ’ সহজেই আপনার আসন ‘ঢ়’ কে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত।

* প্রসিদ্ধ ‘প্রকৃতিবাদ’ অভিধানে’ ‘আইবড়ভাত’এর সংস্কৃত ‘অব্যূঢ়ান্ন’ লিখিত হইয়াছে।

যেমন 'গাঢ়' 'মূঢ়' প্রভৃতি শব্দগুলিতে প্রকৃত পক্ষে 'হ্' ই 'ঢ়' র জন্য নিজের আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ 'গাঢ়' ও 'মূঢ়' প্রভৃতি শব্দগুলির অন্তরালে 'গাহ' ও 'মুহ' ধাতুই বিরাজ করিতেছে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, 'বাহিত' শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া 'বাঢ়' বা 'বঢ়' এবং 'অবি' 'আই'রূপে পরিণত হইয়া "আইবড়" সিদ্ধ হইয়াছে। 'বাহিত' যে বঙ্গপ্রাকৃতে 'বাঢ়' বা 'বড়' হইয়াছে তাহা কিছু আশ্চর্য্য মনে হয় না যখন দেখি সংস্কৃত 'কথিত'শব্দ হিন্দিভাষায় 'কাঢা' হইয়া বিরাজ করিতেছে।

বস্তুতঃ 'অবিবাহিত' অর্থেই "আইবড়" শব্দ চিরদিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'আয়ুর্বৃদ্ধি' বা 'আয়ুর্বৃদ্ধ' অর্থে 'আইবড়' কখনই ব্যবহৃত হয় নাই। বঙ্গের প্রাচীন কবিগণ এই অবিবাহিত অর্থেই "আইবড়" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। দুইশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থে এই 'অবিবাহিত' অর্থেই 'আইবড়' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়—

"ক্ষেপাবুড়া দিগম্বর,
ধাক্কা মারে দূর কর
আইবড় ঝি থাকুক ঘরে।" *
(শিবসংকীর্ত্তন)

অর্থাৎ, মেনকা শিবের ন্যায় বুড়া বরকে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিতেছেন—"বুড়া দিগম্বর ক্ষেপা বরকে ধাক্কা মারিয়া দূর কর, আমার মেয়ের বিবাহ না হয় তাহাও ভাল, সে আইবড় কি না অবিবাহিত অবস্থাতেই ঘরেই থাকুক।"

দশম বর্ষীয়া বালিকা কন্যাকেও হিন্দু গৃহে বিবাহের পূর্ব্বে 'আইবড়' বলে; তাহা কি আয়ুর্ব্বৃদ্ধ বলিয়া, না অবিবাহিত বলিয়া? কবিবর ভারতচন্দ্রও এই অবিবাহিত অর্থেই "আইবড়" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—

* মেদিনীপুরের রাজা যশবন্ত সিংহের সভাসদ ৺ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক এই শিবসংকীর্ত্তন পদ্য গ্রন্থখানি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; পিতৃদেব ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া তাঁহার পুস্তকাগারে ইহার একখানি রক্ষিত হইয়াছিল।

"এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার .

তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার।"

(ভারতচন্দ্র কৃত বিদ্যাসুন্দর)

'আইবড়' যে 'অবিবাহিত' শব্দ হইতে আসিয়াছে তাহার আরও প্রমাণ এই যে, দুইবার বিবাহিত হইলে সেই বরকে 'দোজবেড়ে' বা 'দোজবোড়ে' বলে। * এবং যাহার তিনবার বিবাহ হইয়াছে তাহাকে 'তেজ-বেড়ে বা 'তেজবোড়ে' বলে। 'দোজবড়'র 'দুইবার বৃদ্ধ' এরূপ অর্থ করিলে বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই সকল উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে বড় বা বোড়ে বা বড় শব্দ এস্থলে 'বিবাহিত' শব্দেরই অপভ্রংশ, 'বৃদ্ধ' শব্দের অপভ্রংশ নয়।

---

* 'দোজ' শব্দটা হিন্দি হইতে আসিয়াছে ; 'দুজে' শব্দের অর্থ হিন্দিতে দ্বিতীয়, যথা,

"দুজে অওর নাহি কোয"

'দোজবেড়ে' ভিন্ন বাঙ্গলায় 'দ্বিতীয়' অর্থে "দোজ" শব্দের বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না।

আমাদের দেশে বিবাহ কর্ম্ম প্রভৃতি যেরূপ ভাবে প্রচলিত আছে, তাহাতে বলিতে গেলে বৈদিক বিবাপপদ্ধতিই অনেকটা বজায় আছে। তবে এতকাল ব্যবধানে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও অপভ্রষ্ট আকারে বিদ্যমান—কিন্তু বৈদিক পদ্ধতির মূল কঙ্কাল ঠিকই আছে। বৈদিক গৃহসূত্রাদিতে বিবাহের আনুষঙ্গিক "অবিবাহিতভক্ত" নামে কোন ক্রিয়া কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পরোক্ষ ভাবে বিবাহের পূর্ব্বেই যে ব্রাহ্মণভোজনের বিধান আছে তাহাকেই আমরা 'অবিবাহিতভক্ত' বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বিবাহের পূর্ব্বে যজ্ঞকার্য্য সমাপনান্তে ঋষিরা পুরাকালে যে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ভাত খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করি-তেন, খুব সম্ভবতঃ তাহারই নবসংস্করণ এই 'অবিবাহিত ভক্ত' বা "আইবড়ভাত"। বিবাহ কর্ম্মের পূর্ব্বে ও যজ্ঞ কর্ম্মের অন্তে শাস্ত্রে স্পষ্টই ব্যবস্থা আছে—

"অথ ব্রাহ্মণান্ ভক্তেনোপেপ্সেৎ।"

'অথ' অনন্তরং 'ভক্তেন' অন্নেন 'ব্রাহ্মণান্' নিমন্ত্রি-তান্, 'উপেপ্সেত' ভোজয়েদিত্যর্থঃ। (গোভিল গৃহ্যসূত্র)

"অনন্তর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ভাত ভোজন করাইবে।"

বৈদিক গৃহ্যসূত্রের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে এই ভাত খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইতে আধুনিক 'আইবড়ভাতয়ের' উৎপত্তি।

আমাদের বিবাহের যেমন আদিতে 'আইবড়ভাত' বা 'অবিবাহিতভক্ত' সেইরূপ অন্তে 'বউভাত' বা 'বধূভক্ত'। বিবাহের পরে বৈদিক কালেও বধূভক্ত প্রচলিত ছিল। আজকাল অনেকে এই 'বধূভক্ত' কর্ম্মের সার্থকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করেন এই বলিয়া যে—'নববধূ গৃহকার্য্যে এবং বিশেষ পাককার্য্যে কিরূপ সুনিপুণা, পতিকুলে তাঁহার সুগৃহিণীপণার পরীক্ষার জন্য এই 'বধূভক্তে'র প্রবর্ত্তন। নববধূকে এইদিনে স্বহস্তে পাক করিয়া পতিকুলের সকলকে আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে হয়।' তাঁহাদিগের মতে বধূ প্রথম এই অন্ন-পাকে হস্তক্ষেপ:করেন বলিয়া 'বধূভক্তে'র আরেক নাম 'পাকস্পর্শ'। এই ব্যাখ্যা শুনিতে কিছু মন্দ নয়, কিন্তু

তথাপি ইহা 'বধূভক্তে'র প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। বরঞ্চ বধূভক্তের উদ্ভব ইহার ঠিক বিপরীত কারণে।—

বৈদিক কালে আমরা দেখিতেছি নিম্নলিখিতরূপে 'বউভাত' বা 'বধূভক্ত' সম্পন্ন হইত। বিবাহের পর তৃতীয় দিনে বর যিনি তিনি নিজে অন্ন পাক করিয়া নিজে খাইতেন ও উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট অংশ বধূকে খাওয়াইতেন। পতি সর্ব্বপ্রথম এই দিনে বধূকে খাওয়াইতেন। পতি সর্ব্বপ্রথম এই দিনে বধূকে ভক্ত দান করিতেন বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে 'বধূভক্ত'। সম্ভবতঃ বর বধূকে ভক্তদানে পোষণ করিতে সমর্থ কিনা এইখানে তাহার যেন একরূপ পরীক্ষা হইয়া যাইত। বর স্বহস্তে পাক করিয়া নববধূকে সেই স্থালীপাক অন্ন স্পর্শ করাইতেন এই হেতু বধূবক্তের আরেক নাম "পাকস্পর্শ"।

"শ্বোভূতে বা সমশনীযং স্থালীপাকং কুর্ব্বীত তস্য দেবতা অগ্নিঃ প্রজাপতি বিশ্বেদেবা অনুমতিরিত্যুদ্ধৃত্য স্থালীপাকং ব্যুহৈকদেশং পাণিনাভিমৃশেদন্নপাশেন মণিনেতি ভুক্তো৾চ্ছিষ্টং বধ্বৈ প্রদায় যাথার্থম্।" (গৃহ্যসূত্র গোভিল)

"বিবাহের পরদিনে কিম্বা তৎপরদিনে প্রভাত হইতেই আপনার সম্যক ভোজনযোগ্য পাক প্রস্তুত করিবে। পাক প্রস্তুত কালে অগ্নি, প্রজাপতি বিশ্বে-দেবা ও অনুমতি দেবতা যথাক্রমে আরাধ্য হইবেন। পাক প্রস্তুত হইলে নিজোদর পূরণের উপযুক্ত অন্নাদি পাত্রান্তরে ঢালিয়া 'অন্নপাশেন মণিনা' মন্ত্র পাঠ করত পরিবেশন পূর্ব্বক ভোজন করিবে। পরে ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন বধূকে প্রদান করিয়া স্বয়ং যথেচ্ছ বিচরণাদি করিবে।"

আজকাল আর বৈদিক কালের মত বর স্বহস্তে অন্ন পাক করেন না, কিন্তু এখনও বধূভক্তের দিনে বর বধূ-পোষণের প্রথম চিহ্ন স্বরূপ পাচক বা কারুকপক্ক অন্ন ও বস্ত্র দিতে বাধ্য হন।

প্রকৃত কথা এই যে একালে আমাদের দেশে পুরুষেরা পাকবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সেকালে ঋষিরা যজ্ঞকার্য্যে এবং স্থালীপাক প্রভৃতি নানাবিধ পাককার্য্যে বিশেষ সুনিপুণ ছিলেন; তাই তাঁহারা পত্নীকে বিবাহের পর নিজের স্বহস্তের সুপক্ক অন্ন খাওয়াইতে গৌরব বোধ করিতেন।

গরু
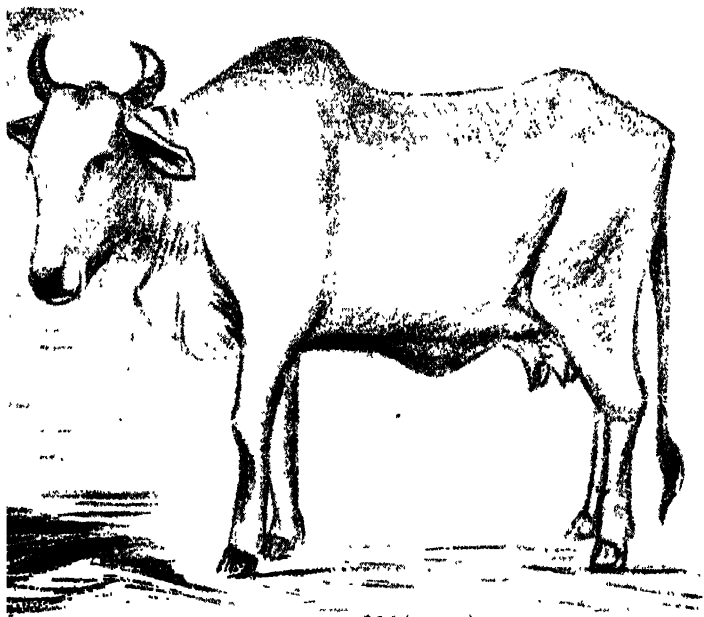
প্রাচীন ভারতের উপমাস্থল গরু

ঋষিরা কি চক্ষেই না জানি গরুকে দেখিয়াছিলেন ! গরুর মত উপকারী জীব জগতে দ্বিতীয় নাই। মানবের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহার অধিকাংশ গরুই যেন পূরণ করিতে সমর্থ। গরু যে ঋষিদের এত সুদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, উহার উপকারিতাই তাহার কারণ। মানবের আহার্য্য সামগ্রী যোগাইবার ভার পরমেশ্বর যেন প্রধানভাবে গরুর উপরেই ন্যস্ত করিয়াছেন ; তাই গোদান ঋষিদের চক্ষে শ্রেষ্ঠ দান এবং গো-সেবা পুণ্যকার্য্যরূপে গণ্য। ঋষির আশ্রমে গরু গৃহদেবতার ন্যায় পূজ্য। গরুই তাঁহাদের পূজার আস্পদ, আবার গরুই তাঁহাদিগের সখা। যাহা কিছু দেখিবেন শুনিবেন সর্ব্বাগ্রে উপমা দিবেন

গরুর সঙ্গে। এইরূপে গরুর সর্ব্বাঙ্গই উপমাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋষিরা যাহা কিছু নূতন দেখিয়াছেন অমনি গরুর একটা না কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত উপমা দিয়া সেই বস্তুর মাহাত্ম্য যেন দ্বিগুণিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রবাদ আছে, অধিক সখ্যভাব সম্মানের হানি করে (familiarity breeds contempt) ; গরুর সহিত মানব জাতির অতি সখ্যভাব বশতঃ গরুকে অনেক সময়ে সম্মানের উচ্চ আসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছে। আমাদের "গোমূর্খ", "গো গর্দ্দভ", "হাবা গবা", "গবাকান্ত" "গবা রাম", "গোবেচারা", "আস্ত গরু", "আস্ত ষাঁড়" প্রভৃতি শব্দ এবং ইংরাজী ভীরু অর্থবাচক coward প্রভৃতি শব্দ উহার নিদর্শন। কিন্তু ঋষিদিগের সময়, এরূপ গরুর নিন্দাবাচক শব্দ বিশেষ ঠাঁই পায় নাই। এসকল অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিককালে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ঋষিদিগের সময়ে পুঙ্গব (ষাঁড় বা মদ্দা গরু) শ্রেষ্ঠ অর্থবাচক ছিল। তাই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষি দিগকে 'মুনি পুঙ্গব' 'ঋষিপুঙ্গব' বলিতেন। যেমন এক্ষণে

বলবান ইংরাজজাতি আপনাদিগকে বৃষের সহিত তুলনা করিয়া 'জনবুল' নামে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন, ঋষিরাও 'পুঙ্গব' বলিতে সেইরূপই গৌরব অনুভব করিতেন। আমরা নিম্নে অনেকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছি।

প্রথমেই "গবেষণা"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। যে গবেষণার মাহাত্ম্য আজকাল এত, যে গবেষণার গৌরবে মহা মহা পণ্ডিতেরা গৌরবান্বিত, পুরাতত্ত্ববিগণ যে গবেষণার বলে ভবিষ্যতের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারেন, সেই গবেষণার মূলে গরু বিদ্যমান। গরু অন্বেষণই 'গবেষণা'র মূলে। সেকালে ঋষিদিগের একটী গাভী যদি চরিতে চরিতে আশ্রমের বহির্দেশে অরণ্যে বা অন্য কোথায় হারাইয়া যাইত, ত তাহার অন্বেষণে তাঁহাদিগকে অনেক মাথা খাটাইতে হইত। হয়ত গরুর পদচিহ্ন ধরিয়া ধরিয়া বহুকষ্টে হারাণ গাভীটী বনের মধ্যে ধরা পড়িত। 'গব' অর্থে গরু এবং 'এষণ' অর্থে অন্বেষণ। আমাদিগকে সেইরূপ এক্ষণে কোন নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে

হইলে অতীতের পদচিহ্ন ধরিয়া ধরিয়া অতিকষ্টে সেই সকল হারানিধি লাভ করিতে হয়।

"গবেষণা"র বিষয় আমরা যেমন দেখাইয়া আসিলাম সেইরূপ আর একটী শব্দের প্রতি পাঠকগণ দৃষ্টিগোচর করুন। তাহা আর কিছু নয় "গোচর" শব্দ। যাহা কিছু জ্ঞানের অথবা জ্ঞানের যন্ত্র স্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত তাহা "গোচরের" অগোচরে নাই—"গোচরের" জ্ঞাতসারে অবস্থিত। "দৃষ্টিগোচর" "শ্রুতিগোচর" "প্রত্যক্ষগোচর" "ইন্দ্রিয়-গোচর" "জ্ঞানগোচর" প্রভৃতি শব্দগুলিই তাহার প্রমাণ। জ্ঞানই "গোচর" শব্দের প্রাণ। 'গোচর' এর অর্থই জ্ঞাতসার। কিন্তু 'গোচর' শব্দের মর্ম্মে এই জ্ঞান আসিল কিরূপে? গোচর শব্দের অন্তরে জ্ঞানের এই মহান বিকাশ দেখিয়া কে মনে করিবে যে ইহার উৎপত্তি সামান্য গোচারণ ক্ষেত্রে? "গোচর" শব্দ 'গো' ও 'চর' এই দুইটি শব্দের যোগে উৎপন্ন। ইহার অর্থ স্পষ্টই ধরা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে গরু আশ্রমের যেটুকু স্থানের মধ্যে চরিয়া বেড়াইত, সেই পরিষ্কৃত

ভূমিটুকু জ্ঞানের বা দৃষ্টির বিষয় ছিল, তাহার পরে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অরণ্য। এইরূপে পাঠক দেখুন গরুর বিচরণের স্থান হইতেই 'গোচর' অর্থে জ্ঞান আসিয়াছে। গরুর যাতায়াতের সামান্য পথটি পর্য্যন্তও ঋষিদিগের উপমাদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তাঁহারা একটী প্রধান বৈদিক গ্রন্থের, গোপথের নামে নামকরণ করিয়াছেন—যথা 'গোপথ ব্রাহ্মণ।'

যখন সন্ধ্যায় গোবৃন্দ মাঠ হইতে গোষ্ঠে ফিরিয়া যায়, তখন তাহাদের পদোত্থিত ধূলি আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাই সন্ধ্যার আরেক নাম 'গোধূলি।'

গরু যে ঋষিদিগের কিরূপ সমাদরের পাত্র ছিল তাহার পরিচয় আমরা 'গোত্র' ও গোষ্ঠী' শব্দের আলোচনায়ও অনেকটা পাই। গোত্র অর্থে মহদ্‌কুল। যে কুল শাণ্ডিল্য, কশ্যপ প্রভৃতি কোন মহামুনি হইতে উদ্ভূত তাহা গোত্র নামে অভিহিত হয়। 'গোত্র' শব্দের একেবারে মূল ধরিতে গেলে আমরা দুটী শব্দ পাই— 'গো' অর্থে গরু, 'ত্র' অর্থে ত্রাতা, বা রক্ষক। মৌলিক অর্থ ধরিতে গেলে যেখানে বা যে বংশে গোবৃন্দ পালিত

হয়, তাহার নাম গোত্র। গরুর পালন কেন ?—দুগ্ধাদির দ্বারা অতিথি সেবা প্রভৃতি সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য। সেকালে হয়ত গোত্রপ্রবর্ত্তক মহামুনিদিগের আশ্রমে এমন সহস্র সহস্র গোধন রক্ষিত হইত।

আবার দেখুন 'গোষ্ঠী' শব্দ ; ইহাও 'গোত্র' শব্দের প্রায় সমান অর্থবাচক। 'গোষ্ঠ' শব্দের অর্থ গরুরা যেখানে থাকে অর্থাৎ গোশালা। প্রকৃতপক্ষে পুরাকালে গোরক্ষণের জন্য যাঁহাদিগের গোষ্ঠ বা গোশালা থাকিত, তাঁহাদের বংশই মহদ্গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত হইত ; কারণ সেকালে গোধনই ঋষিদিগের জীবন ছিল—গোধনেই তাঁহারা আপনাদিগকে সম্পত্তিশালী মনে করিতেন।

এইবারে আমরা দেখাইব যে গরুর আপাদমস্তক প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কোন না কোনরূপে উপমিত না হইয়া যায় নাই। প্রথমে মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পুচ্ছ পদ পর্য্যন্ত দেখাইব যে গরুর একটী অঙ্গও উপমা-স্থল না হইয়া ছাড়ান পায় নাই। এক গোমুখই কত-রূপে তুলনাস্থল হইয়াছে। হিমালয়ের এক প্রধান

তীর্থ গোমুখের সদৃশ দেখিতে বলিয়া 'গোমুখী তীর্থ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গোমুখাকৃতি বাদ্যযন্ত্রের নাম "গোমুখ"। শঙ্খ বিশেষেরও নাম "গোমুখীশঙ্খ"। জপমালার থলিটিও গোমুখের সহিত উপমিত হইয়াছে। 'গোশৃঙ্গ' পর্ব্বত বিশেষের নাম—উহার কারণ ঐ পর্ব্বত দেখিতে অনেকটা গোশৃঙ্গাকৃতি। গোশৃঙ্গাকৃতি বলিয়া সামরিক যন্ত্রবিশেষেরও নাম 'গোশৃঙ্গ'। এইবারে 'গবাক্ষে' বা গরুর চক্ষে দৃষ্টিপাত করুন। গৃহের জানালার নাম গরুর চক্ষের সঙ্গে তুলনা দিয়া ঋষিরা 'গবাক্ষ' রাখিয়াছেন। আবার বৃষ বা পুঙ্গবের চক্ষের সঙ্গে ইঁদুরের সাদৃশ্য দেখিয়া ইঁদুরের এক নাম রাখা হইয়াছে 'বৃষলোচন'। গরুর কর্ণের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন বিতস্তি বা বিঘতের সঙ্গে। বস্তুতঃ 'গোকর্ণ' এক বিতস্তি পরিমাণ লম্বা। আবার জল পান কালে যে গণ্ডুষ করা হয়, সে সময় করতলের আকৃতি অনেকটা গোকর্ণের মত হয়, তাই 'গোকর্ণ' গণ্ডুষকেও বুঝায়। আবার তীর্থবিশেষেরও নাম 'গোকর্ণ'। রঘুবংশে এই গোকর্ণতীর্থের উল্লেখ করিয়া কালিদাস লিখিয়াছেন :—

অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ
শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্।
উপবীণয়িতুং যযৌ রবে-
রুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ ॥

"তৎকালে দেবর্ষি নারদ, দক্ষিণসমুদ্রের উপকুলস্থিত "গোকর্ণতীর্থে" প্রতিষ্ঠিত মহাদেবকে বীণাবাদন পূর্ব্বক আরাধনা করিবার নিমিত্ত, দক্ষিণায়ন কালে সূর্য্যদেব যেরূপ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছিলেন।" চোখ কাণ হইল, এইবারে নাসিকা বাকী। গোনাসার তুলনাটীতে বেশ নূতনত্ব আছে; বৃহদাকার অজগর সর্পের মুখের সঙ্গে অনেকটা গোনাসিকার সাদৃশ্য আছে বলিয়া, বৃহদাকার সর্পেরই নাম "গোনাস" হইয়াছে। এইবারে জিহ্বার পালা। আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ বিশেষের নাম 'গোজিহ্বা', উহা দেখিতে গোজিহ্বার ন্যায় বলিয়া।—

গোজিহ্বা কুষ্ঠ মেহাস্রকৃচ্ছ্রজ্বরহরী লঘুঃ।

জিহ্বা যদি হইল দন্ত বাদ যায় কেন? গোদন্ত

উপমিত হইয়াছে হরিতালের সঙ্গে। হরিতাল ভেদের নাম "গোদন্ত হরিতাল।"

"গোস্তন" দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরের নাম—উহা দেখিতে গরুর বাঁটের ন্যায় বলিয়া।

আয়ুর্ব্বেদে আছে—

বৃষ্যাস্যাৎ গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বীচ কফপিত্তনুৎ।

"গোস্তনী বা দ্রাক্ষা বলকর গুরু ও কফপিত্ত নাশক।"

চারনল হারের নামও গোস্তন। গোস্তনের ন্যায় চারিটি একত্রে থাকে বলিয়া চারিনল হারের নাম 'গোস্তন'।

গোষ্পদের উপমা ত লোকের মুখে মুখে; যথা, "গোষ্পদীকত সাগরাম্' ইত্যাদি। "গোক্ষুর"—স্বনাম খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ, ইহা ভারী পুষ্টিকর; ইহার আকৃতি অনেকটা গরুর ক্ষুরের মত, তাই ইহার নাম 'গোক্ষুর'। সর্পবিশেষেরও নাম 'গোক্ষুর'। সর্ব্বশেষে পুচ্ছ। গো-পুচ্ছের সহিত হারবিশেষের তুলনা করিয়া উহার নাম 'গোপুচ্ছ' রাখা হইয়াছে। গো-লোমের সঙ্গে তুলনা দিয়া দেখা যায় শ্বেতদুর্ব্বারও নাম দেওয়া হইয়াছে "গোলোমী।"

গো-মেদ অর্থাৎ গরুর চর্ব্বি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। গরুর চর্ব্বি, নবরত্নের অন্যতম রত্ন 'গোমেদে'র সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। গরুর চর্ব্বির ন্যায় অনেকটা দেখিতে বলিয়া উহার নাম "গোমেদ।"

মুক্তাফলং হীরকঞ্চ বৈদুর্য্যং পদ্মরাগকং
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলঙ্গারুত্মতন্তথা।
প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব॥
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

এই ত গেল গরুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা। এক্ষণে দেখাইব, সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান আস্ত গরুটীও নানা ভাবে নানারূপে উপমিত হইয়াছে।

প্রথম উল্লেখযোগ্য উপমা—বৃষের সঙ্গে বেদের; কারণ বৃষও চতুষ্পদ এবং বেদও চতুর্ব্বেদ।

বেদো হি বৃষউচ্যতে।

আবার পৃথিবীর সঙ্গে গরুর উপমা। যথা, 'গোরূপ-ধরা পৃথিবী'। চতুর্যুগও বৃষের সহিত তুলনীকৃত হইয়াছে। 'ধর্ম্মরূপী' বৃষ'র কথা ত সকলেই জানেন। বৈদিক গ্রন্থ আরণ্যকে মেধাও গরুর সহিত উপমিত

হইয়াছে।—'অপ্সরাসু যা মেধা গন্ধর্ব্বেষু চ যন্মনঃ দৈবী মেধা মনুষ্যজা সা মাং মেধা সুরভি র্যুষতাং।'

'অপ্সরার ও গন্ধর্ব্বের যে মেধা, দেবতার ও মনুষ্যের যে মেধা, শোভনগন্ধা গাভীর ন্যায় সেই মেধা আমার সেবা করুন।'

দেবনামে অনাদর।

আমরা খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে ভগবানের নাম দেবতার নাম করিতে উপদেশদানে পটু, কিন্তু দেবতার নামে ভগবানের নামে আমাদিগের বড় একটা আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিতে পাই না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "Familiarity breeds contempt" অর্থাৎ 'অতি পরিচয় অবজ্ঞা উৎপাদন করে', সেই কারণে আমাদিগেরও বোধ হয় দেবতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি অতি সামান্য পরিমাণে লক্ষিত হয়। কথায় কথায় গীতা হইতে শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক আমরা ধর্ম্মপ্রাণের বাহ্যিক মুখোষ পরিয়া লোকমুগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে পেটে পেটে আমরা যে দেবতাকে বেশ অবজ্ঞা বা অনাদর চক্ষে দেখি তাহার

যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমাদিগের মাতৃভাষা হইতে আমরা তাহার উদাহরণ দেখাইতে প্রস্তুত। দেবতার প্রতি, ভগবানের প্রতি, যদি যথার্থই শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিবে ত ভগবানের নাম লইয়া দেবতার নাম লইয়া অশ্লীলতা, যথেচ্ছাচারিতা, এবং ঘৃণা অবজ্ঞা ও উপহাস-চ্ছলে দেবতার নাম প্রয়োগ, আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষায় এ সকল প্রচুর পরিমাণে স্থান পায় কেন? অথবা এই নৈয়ায়িক ও তার্কিকের দেশে বুঝি সকলি সম্ভবে। দেবতা ও ভগবানকেও ন্যায়ের ফাঁকির মধ্যে আনিয়া অভক্তি ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কুটীল নৈয়ায়িক বা তার্কিকগণের অনেক সময়ে গৌরবের বিষয় হইতে দেখা যায়।

প্রথমেই 'দেব' শব্দকে সম্মুখে করিয়া আমাদিগের আলোচ্যপথে অগ্রসব হওয়া যাক্। যে 'দেব' শব্দ বৈদিক ঋষিদিগের ধ্যানের ও জ্ঞানের এবং তপোলব্ধ সামগ্রী ছিল, যে 'দেব' শব্দের মাহাত্ম্যে সেই ঋষিযুগে সমগ্র জগৎ দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গ-ভাষায় সেই 'দেব' শব্দের দুর্দ্দশা দেখিয়া কে না ধিক্কার

দিবে। এই মহিমান্বিত গুরুগম্ভীর বৈদিক 'দেব' শব্দকে লইয়া যথেচ্ছরূপে পূতিগন্ধময় স্থানে প্রয়োগ করিতে বাঙ্গালী আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমরা কখনো উপহাসচ্ছলে কখনো অবজ্ঞার ভাবে নানা বিকৃতরূপে 'দেব' শব্দের অপব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। 'অসুর' 'দৈত্য' 'দানব' প্রভৃতি 'দেব'-বিরোধী শব্দগুলিকে বরঞ্চ কতকটা ভয়ের ভাবে সম্মান দিয়া থাকি, যেমন আমরা বলি 'ও লোকটা ভীষণ অসুর' 'উহার শরীরে আসুরিক বল', কিন্তু পবিত্র দেব নামকে নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে ইচ্ছামত অনাদর ও অবজ্ঞার স্থলে ব্যবহৃত করিয়া বঙ্গভাষায় আমরা বিকারসুখ উপভোগ করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎ-পদ নহি। যখন কোন ব্যক্তির উপরে ঘৃণা ও নিন্দা-বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠি "যেমন দেবা তেমনি দেবী" তখন স্বর্গধামে দেবহৃদয়েও বুঝি উহা আঘাত না করিয়া যায় না। 'দেব' শব্দ যথার্থই যদি পূজার আস্পদ হয় তবে বঙ্গভাষায় সে শব্দের এরূপ অবমাননা কেন ?

আবার দেখুন "দিব্যিগালায়" এই দেব শব্দের অঙ্গীভূত 'দিব্য' শব্দের কি কদর্য্য ব্যবহার! কোথায় ঋষিদিগের 'দিব্য' শব্দের দীপ্ত মহিমা, আর কোথায় বঙ্গের ঘৃণিত "দিব্যিগালা"! বৈদিক ঋষি পঞ্চমস্বরে বলিয়াছিলেন "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল! তোমরা শ্রবণ কর; আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি"—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

সে সুগম্ভীর উচ্চকণ্ঠে 'দিব্য' শব্দের কি মহত্ত্ব, আর এই ঘৃণিত শপথকালে 'দিব্য' শব্দের প্রয়োগে কি নীচতা, তাহা পাঠক একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। বেদে বাক্যকে 'দিব্য' বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, যথা—

'দিব্যা বাক্"

ইহার মধ্যে কি দীপ্তি কি সৌন্দর্য্য, আর আমাদের 'দিব্যিগালা'য় কি কদর্য্য জঘন্যতা! অবশ্য 'দিব্য-জ্যোতি', 'দিব্যজ্ঞান', 'দেবভাব', এইরূপ গুরুগম্ভীর

শব্দেরও বঙ্গভাষায় অভাব নাই—কিন্তু এ সকল শব্দ উপনিষদাদির ছায়ায় উৎপন্ন। এ সকল সুশিক্ষিত-দিগের লিখিত ভাষায় স্থান পায়, কিন্তু কি ইতর কি ভদ্র, সকল শ্রেণীর মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা 'দিব্যিগালনের' মধুর সম্ভাষণ হইতে একেবারে মুক্ত। মাতা পিতা ও গুরু শাস্ত্রে দেবসম্মানে সম্মানিত।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে—

মাতৃদেবো ভব।

পিতৃদেবো ভব।

আচার্য্যদেবো ভব।

এই পবিত্র 'মাতৃ' শব্দ হইতে বঙ্গভাষায় কি কুৎসিৎ "মাতৃ-দিব্যি" অর্থাৎ 'মাইরি' 'বল্ মাইরি' কথার সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন আজকাল দশ পনের বৎসরের বালক এবং যুবকগণের মুখে চুরট ও সিগারেটের ছড়াছড়ি, সেইরূপ এই কুৎসিৎ 'মাইরি' দিব্যগালনও বিদ্যালয়ের বালকগণের মুখে মুখে বিরাজমান। বঙ্গের এই 'দিব্যি'র হস্ত হইতে কেহই সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। ইতর

শ্রেণীর লোকদিগের ত কথাই নাই, এমন কি অনেক ভদ্রগৃহস্থ পরিবারের মধ্যেও দিব্যিগালন দেখিয়াছি সহজ কথার ন্যায়প্রচলিত। মাতা, পিতা, আচার্য্য, পুস্তক, গঙ্গাজল প্রভৃতি যাহা কিছু মর্ত্ত্যভূমিতে পবিত্র বস্তু আছে, বঙ্গের দিব্যিগালনের কলুষহস্ত তাহাকেই স্পর্শ না করিয়া যায় নাই ; এমন কি স্বয়ং ভগবানও বাদ যান নাই। 'মায়ের গা ছুঁয়ে দিব্যি', 'ছেলের মাথার দিব্যি', 'বই ছুঁয়ে দিব্যি', 'গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি', 'আমার দিব্যি', 'তোমার দিব্যি', 'গুরুর দিব্যি', ত আছেই ; এতদ্ব্যতীত কোন কোন পরিবারে 'ঈশ্বরের দিব্যি' বলিতেও শুনিয়াছি।

এইবারে আমরা দেখাইব বিশেষ বিশেষ দেবতার নাম লইয়া বঙ্গভাষায় কিরূপ অনাদর অভক্তি ভাবের ছড়াছড়ি হইয়াছে। কতস্থলে ব্যঙ্গবিদ্রূপচ্ছলে, কতস্থলে ঘৃণা উপেক্ষা ও উপহাসের সহিত, কতভাবে এবং কতরূপে যে বঙ্গভাষায় নানা দেবতার নাম কলুষিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বাগ্রে 'রাম', নাম লইয়া আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হই

শ্রীরাম চন্দ্র হিন্দুর শ্রেষ্ঠ অবতার।—সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে হিন্দুরা ইঁহাকে দেখিয়া থাকেন। ভারতের সর্ব্বত্র ইনি দেবতারূপে পূজ্য। অনেকে রামের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনের জন্য, এমন কি পুস্তকের পৃষ্ঠা গণনাসূত্রে অথবা যে কোন সূত্রে হউক, এক উচ্চারণ করিবার কালে এক না বলিয়া রাম নাম লয়েন—১, ২, ৩ না বলিয়া 'রাম দুই তিন' বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ ইহাতে 'রাম' নাম, এক বা একমেবা-দ্বিতীয়ং এর স্থান অধিকার করিতেছে ইহাই সূচিত হয়। কিন্তু এই অতিভক্তির ফলে বঙ্গভাষায় রাম নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়াছে বৈ বর্দ্ধিত হয় নাই। কোন ঘৃণিত দ্রব্য ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই হিন্দু স্বভাবতই "রাম রাম" উচ্চারণ করেন। কিন্তু ক্রমাগত কলুষিত পদার্থের সংস্পর্শে এমন পবিত্র শব্দ "রাম" নামও কলুষিত না হইয়া যাইতে পারে না। প্রথমে যদিও ঘৃণা জয়ের জন্য দেবনাম স্মরণ হইতে ইহার সূত্রপাত, তথাপি ইহা আজ-কাল পূর্ব্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিজেই যেন ঘৃণাবাচক হইয়া দাঁড়াইছে।

'রাম' নাম যে ঘৃণা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও উপহাস-ব্যঞ্জক শব্দরূপে অধিকস্থলে ব্যবহৃত হয়, নানা উদাহরণ দ্বারা আমরা তাহা প্রমাণ করিব। যাহা হিন্দুর বিরাগভাজন—অখাদ্য, অশ্রাব্য বা অদর্শনীয়, তাহাই বঙ্গে 'রাম" শব্দবাচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—তাই হিন্দুর অখাদ্য পক্ষী 'রামপাখী" নামে অভিহিত হয়। গরু হিন্দুর পূজা—অবধ্য, ছাগ হিন্দুর বধ্য—অশ্রদ্ধার পাত্র; ছাগের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য আমরা বলি "রামছাগল"। অবশ্য আপনারা বলিবেন এস্থলে 'রাম' শব্দ বৃহদ্বাচক। কিন্তু দেখুন গরুও ত ছাগলের ন্যায় দুই জাতীয় আছে—এক রামছাগলের ন্যায় বড় জাতের পাহাড়ী গরু, আর এক নিম্নভূমির ক্ষুদ্রকায় গরু; কিন্তু পাহাড়ী গরুকে আমরা কৈ ত 'রামগরু' বলি না, কিন্তু অন্য নামে যেমন 'নাগরা গরু' ইত্যাদি নামে বলিয়া থাকি। 'রামছাগলে' "রাম" শব্দ কতকটা বৃহদ্ব্যঞ্জক হইলেও উহা যে অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেননা ছাগল হিন্দুর চক্ষে হেয় জীব—অশ্রদ্ধার পাত্র। সচরাচর

বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের বিশ্বাস, 'ছাগল গৃহের অমঙ্গল-প্রার্থী'—'ছাগল চায় গৃহে মানুষ না থাকে, খট্‌খটে ডাঙ্গায় সে একলা বিচরণ করে' ; আর গাভী লোক চায়, সেবা চায়—উহা লক্ষ্মীস্বরূপা। আরো অন্যান্য উদাহরণ আমাদের কথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। বর্দ্ধমান বীরভূম অঞ্চলে গ্রামবাসী হিন্দুরা ঢেড়স্ খায় না ;— উহা মুসলমানের খাদ্য, এই কারণে হেয় পদার্থে বলিয়া গণ্য। ঢেঁড়সকে হিন্দুরা হেয় চক্ষে দেখে বলিয়া, উহার নাম দিয়াছে "রাম ঝিঙ্গা" অর্থাৎ ঝিঙ্গা জাতীয় সবজীর মধ্যে উহা ঘৃণ্য বা অখাদ্য। এই যে নীরস চিমটি, ইহা যে কিরূপ অপ্রিয় তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। এমন যে অপ্রিয় চিমটি তাহাকে 'রাম' নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয়—'রাম চিমটী' ; যথা, 'এসো এক রাম চিমটি দিই' অর্থাৎ এক স্থূল চিমটি দিই। এস্থলে রাম শব্দ বৃহদ্ব্যঞ্জক হইলেও এইরূপ অবজ্ঞা ও উপহাস সহকারের হেয় পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত হওয়ায় উহার নীচার্থ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে—'রাম' নাম কলুষিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কোন ভাল বিষয় বা ভাল বস্তু সূচিত করিবার জন্য বঙ্গভাষায় রাম নামের ব্যবহার সচরাচর প্রায় দেখা যায় না। যে কদলী প্রদর্শনে সকলকে অবজ্ঞা করা যায়, যে কদলী বনুবংশীয়দিগের প্রিয় খাদ্য বলিয়া সাধারণের এক উপহাস ও অবজ্ঞার চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেই হেয় বস্তু রম্ভার বৃহত্ত্ব প্রদর্শন কালে অমনি "রাম" নাম যুক্ত করিয়া "রাম রম্ভা" বলা হইয়া থাকে : আরেকটী উদাহরণ দেখাই—সংস্কৃতে রাম-ধনুকে ইন্দ্রধনু বা ইন্দ্রায়ুধ বলে ; আমরা বাঙ্গলায় "রামধনু" বলি। কেন ? কেবল বৃহৎ ধনুকাকৃতি বলিয়াই যে আমরা বৃহত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য রামধনু বলি তাহা নয়, উহা অদর্শনীয় পদার্থ বলিয়া, অবজ্ঞার ভাবে উহা বাঙ্গলায় 'রামধনু' নামে অভিহিত হয়।

মনুতে আছে—

ন দিবীন্দ্রায়ুধং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্দর্শয়েদ্বুধঃ

"আকাশে ইন্দ্রধনু দেখিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কাহাকেও দেখাইবেন না।"

সুশ্রুতেও আছে—"নচোল্কাপাতেন্দ্রধনূংষি !"

"উল্কাপাত ও ইন্দ্রধনু দেখিয়া কাহাকেও বলিবে না।"* শাস্ত্রে ইহা অদর্শনীয় হেয় পদার্থরূপে গণ্য হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গলায় ইন্দ্রধনুর পরিবর্ত্তে 'রামধনু' শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। যেখানে হেয় ভাব, অবজ্ঞার ভাব, সেইখানেই বঙ্গভাষা "রাম" শব্দ অগ্রে করিয়া চলিয়াছেন। যেমন অতি ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিকে উপহাসচ্ছলে অবজ্ঞা সহকারে বলা হয় "ক্ষুদে রাম", "বেঁটে রাম", "কুটকুটে রাম", "পুঁচকে রাম", "নেংটী রাম", "হাঁদা রাম", "বোকা রাম", "হাবা রাম", "গবা রাম", "ভোঁদা রাম", "পক্ষীরাম" (খুব রুগ্ন লোককে ঘৃণাসহকারে বলা হয়), "আত্মা রাম" (এস্থলে অবজ্ঞা বা উপহাসচ্ছলে বলা হয়, যথা, 'আত্মারাম শুকাইয়া গেল' ইত্যাদি। আবার কোন ব্যক্তির অদ্ভুতরূপ দেখিলে অনেকে উপহাসচ্ছলে বলেন "বাঞ্চারাম আর কি" "পেরুরাম আর কি"। হিন্দুস্থানে কিন্তু রাম নামের সদাসর্ব্বদা ব্যবহার থাকিলেও উহাদিগের মধ্যে "রাম" নামের প্রতি শ্রদ্ধা আদর কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই

*সুশ্রুত, চিকিৎসিত স্থান, ২৪শ অধ্যায়।

—উহার মাহাত্ম্য এখনও প্রবল। বন্ধুতে বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে উহারা মধুর সম্ভাষণে যখন "রাম রাম" বলে তখন তাহা বড়ই মিষ্ট লাগে। আবার পশ্চিমবাসী-দিগের "জয় সীতারাম" ইত্যাদি বাক্য রামের মহত্ত্ব প্রাণে জাগ্রত না করিয়া যায় না। রাম নাম ত দূরে থাক্, রামানুচর হনুমান দেবের নামটীও এমন কি হিন্দুস্থানীদিগের বড়ই প্রিয়। যে নামে সম্বোধন করিলে বাঙ্গালী হয়ত গালাগালি বুঝিয়া চটিয়া লাল হইবেন, পশ্চিমবাসীরা সেই হনুমান নাম অতি আদরে নিজ পুত্রের নাম রাখিতে উদ্যত।

এইবারে আরেকটী দেবতার নাম বলিব, যাঁহার নাম-সৌন্দর্য্য কলুষিত হইয়া বাঙ্গলায় এক অতি জঘন্যরূপে পরিণত হইয়াছে। এই নাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর নাম 'শ্রী'। অবশ্য এই "শ্রী" শব্দের সুশ্রী যে বঙ্গভাষায় একেবারে লোপ পাইয়াছে তাহা বলিতেছি না। শ্রী বঙ্গভাষায় রূপবতী হইয়া আছেন সত্য, কিন্তু সংসর্গদোষে উহার রূপমাধুরী চলিয়া গিয়া কোন কোন স্থলে অতি জঘন্য কুরূপে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। তাহার

উদাহরণ 'ছিঃ' শব্দ। এই 'ছিঃ' শব্দ যাহা ঘৃণাব্যঞ্জক তাহা "শ্রী" শব্দেরই বিকৃত রূপ। এই 'শ্রী' শব্দের যে এই 'ছিঃ' রূপ দুর্দ্দশা তাহা সহসা মনে আনিতেও ঘৃণা হয়। 'শ্রী'তে 'ছি'তে একেবারে বিপরীত ভাব। কোথায় সৌন্দর্য্যের আধার শ্রী, আর কোথায় মলিনতা ও বিকৃতির আধার 'ছিঃ'। অতি ঘৃণিত দ্রব্য দেখিলে বা শুনিলে বা আঘ্রাণ করিলে আমরা 'ছিঃ ছিঃ' শব্দে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করি, চক্ষু মুদ্রিত করি, না হয়ত নাসিকাগ্রে অঙ্গুলী দিয়া নিশ্বাস রোধ করি। এই 'শ্রী' শব্দকে আবার একটু সহজ করিয়া আমরা 'ছিরি' করিয়া লইয়াছি। এই 'ছিরি'ও সচরাচর ঘৃণা ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত উপহাসচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, "কি ছিরি আর কি" "চমৎকার ছিরি" ইত্যাদি। 'ছিরি' শব্দটাও "শ্রী"র আরেক বিকৃত রূপ। এই 'ছিঃ' শব্দ হইতে ঘৃণাব্যঞ্জক 'ছ্যাঃ' 'ছোঃ' প্রভৃতি শব্দ গুলিও প্রসূত। "হতশ্রী" থেকে 'হতচ্ছাড়া' শব্দ আসিয়াছে।

স্বুদ্ধ শ্রী বা লক্ষ্মী দেবী কেন, হিন্দুর অধিকাংশ দেব-দেবীই বঙ্গভাষায় শ্রীহারা হইবার উপক্রম হইয়াছে।

কোন কুবিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইলে অনেকে বলিয়া উঠেন 'দুর্গাদুর্গা' 'শিবশিব' অথবা 'হরেকৃষ্ণ' 'রাধাকৃষ্ণ' ইত্যাদি। এই দেবনামগুলির যদিও এক্ষণে সম্পূর্ণ কদর্য্য অর্থ দাঁড়ায় নাই, তথাপি মনে হয় যে, আর অল্পকাল মধ্যে এই শব্দগুলি দেববাচক না হইয়া কদর্য্য অর্থ জ্ঞাপক হইবে—হয় ঘৃণা বা অবজ্ঞাসূচক, না হয় তুচ্ছ বিষয়জ্ঞাপক হইবে। অবশ্য এই দেবনামগুলি ঘৃণা জয় করিবার জন্য, কুভাব মন হইতে অপসারিত করিবার জন্যই উচ্চারিত হয় ; কিন্তু এত বাড়াবাড়িরূপে অতিমাত্রায় প্রচলিত হইতে চলিয়াছে, যে, ইহার বিশুদ্ধ ভাব দেব-অর্থ আর বেশী দিন বুঝি টিঁকে না।

অনেকগুলি দেবনাম, দেখা যায়, দেবতাদিগের হেয় প্রকৃতির গুণে বঙ্গভাষায় অবজ্ঞা বা অনাদরের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে ; যেমন যমদেব। কথায় বলে 'যমভূত' 'যেন যম'। দেবী চণ্ডীও এই উগ্রপ্রকৃতির কারণে অনাদরের পাত্র। কেহ কোন কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইলে আমরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ "আস্ত ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডী" নামে অভিহিত করি। কিম্বা কোন কোপনস্বভাবা

স্ত্রীর প্রতি 'চণ্ডী' উপাধি বর্ষণ না করিয়া ছাড়ি না। এতদ্ভিন্ন 'উড়নচণ্ডী' 'বাঘাচণ্ডী' ত যেখানে সেখানে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অশ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষা প্রয়োগে দেবী চণ্ডীর প্রতি হিন্দুহৃদয়ের বড় একটা শ্রদ্ধা আছে বলিয়া সহজে মনে না হওয়াই সম্ভব। বিশুদ্ধিকারিতা প্রভৃতি নানা গুণের কারণে অগ্নিদেব যেমন হিন্দুর শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি উগ্র দাহকারিতার জন্য উহা অবজ্ঞারও পাত্র না হইয়া যায় নাই। তাই সচরাচর উগ্র ক্রোধী ব্যক্তির সঙ্গে অবজ্ঞার ভাবে অগ্নির তুলনা দেওয়া হয়—"যেন অগ্নিশর্ম্মা"। আবার কুরূপের গুণেও অনেক দেব দেবীর নাম অবজ্ঞাসহকারে অথবা বিকৃতরূপে উচ্চারিত হয়; যেমন, 'কালীভূত বা কেলেভূত' বলা হয়। 'কালীকৃষ্ণ' না বলিয়া 'কেলেকিষ্টি' বলা হয়। অবশ্য আপনারা যদি বলেন, এস্থলে 'কালী' প্রভৃতি শব্দগুলি রূপবাচক, দেববাচক নহে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে, যখন ঐ একই শব্দ দেববাচকও বটে তখন উহা ঐরূপভাবে অবজ্ঞাসহকারে উচ্চারণ না করাই শ্রেয়। যমভগ্নী দেবী যমুনার নামও কৃষ্ণ বর্ণের জন্য ঘৃণা ও অনাদরব্যঞ্জক

হইয়া উঠিয়াছে : যথা, 'কালিন্দী ভূত।' কালিন্দী যমুনার এক নাম।

বঙ্গভাষায় 'শং' শব্দের অতি জঘন্য দশা। দেবতার কুরূপই তাহার কারণ। 'শং শব্দো মঙ্গলার্থঃ' সংস্কৃতে যে 'শং' শব্দের উচ্চ মহান মঙ্গল অর্থ উহার দিব্য মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, বাঙ্গলায় তাহার ঘৃণিত জঘন্য অর্থে পরিণতি দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই 'শং' শব্দের অন্তরে দেবনাম লুক্কায়িত। মঙ্গলরূপ শিবের নাম 'শঙ্কর' হইতেই 'শং' শব্দের উৎপত্তি। এই ভস্মলিপ্ত কদাকার ভূতপ্রেতবেষ্টিত মহাদেব শিবের নাম 'শঙ্কর' হইতে আমাদিগের ঘৃণা বীভৎস ও উপহাস-মিশ্রিত 'শং' কথা আসিয়া থাকিবে। গতবর্ষের সমাপ্তি বা লয় কালে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে লয়মূর্ত্তি শঙ্করের অপরূপ রূপের অনুকরণ হয়। শৈবসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সাধুরাই এইদিনে উৎসব করেন। 'শং' তামাসা এই উৎসবের অঙ্গীভূত। বস্তুতঃ শঙ্করের 'শং' হইতেই এই 'শং' শব্দের উৎপত্তি এবং উহার সঙ্গে সন্ন্যাসীর 'সং' ও সংক্রান্তির 'সং' গুণীভূত হইয়াছে মাত্র। বঙ্গভাষায়

'শং' শব্দে অতি জঘন্য বা কদাকার রূপের প্রতিই সচরাচর ঘৃণার সহিত প্রযুক্ত হয়। প্রচ্ছন্নরূপধারীর প্রতিও অবজ্ঞার ভাবে 'শং' শব্দ প্রযুক্ত হয়। ইংরাজী sham শব্দের সহিত আমাদের এই 'শং' শব্দের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। মঙ্গলকারী শঙ্করের এই মঙ্গলবাচক 'শং' শব্দের বঙ্গভাষায় এই ঘৃণিত অর্থ কোথা হইতে আসিল?—স্বয়ং মহাদেব শঙ্করের জঘন্যরূপই ইহার কারণ। মহাদেব শিবের অন্তরে মহান মঙ্গলভাব প্রচ্ছন্ন, কিন্তু তাঁহার বর্হিমূর্ত্তি অতি জঘন্য। একটী হিন্দুস্থানী গানে শিবকে তাই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

"মহাযোগযোগী অত জঘ্ন রূপ"

জঘন্যরূপ শিবের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন যে লোকপ্রিয় দেবতা কৃষ্ণ তাঁহারও নাম হাস্য উপহাসচ্ছলে বড় অল্প ব্যবহৃত হয় না। কোন ব্যক্তির ভাবভঙ্গী বা চলন যদি কাহারও মনোমত না হয়—অপ্রিয় বোধ হয়, তাহা হইলে সে কেমন রঙ্গসহকারে বলিয়া উঠে "ধিনি কৃষ্ণ তিনি তা" বা "যেন ত্রিভঙ্গ নটবর এলেন"

"গোবর্দ্ধন আর কি"। এই সকল বাক্যপ্রয়োগ বড় একটা হিন্দুর দেবভক্তির পরিচায়ক নহে। এই সকল অনাদরবাচক শব্দগুলি বাঙ্গালীর মুখে মুখে। বাঙ্গালী হিন্দু অহিন্দু সকলেই প্রায় নিঃসঙ্কোচে এইরূপ বাক্যসমূহ ব্যবহার করিয়া যান—তখন তাঁহারা এটুকু ভাবেন না যে ইহাতে দেবনামেও আঘাত পড়ে। সুরূপের জন্য হিন্দুর দেবতা কার্ত্তিক বিখ্যাত। কিন্তু কার্ত্তিকের যে গুম্ফবিশিষ্ট হিন্দুস্থানী ছাঁদে মস্তকে বিঁড়া দিয়া মূর্ত্তি গড়া হয়, তাহা আজকালের বাঙ্গালী নব্য হিন্দুর চক্ষু তৃপ্ত করিতে পারে না—তাই কাহারও রূপ বা মূর্ত্তি বা চেহারা উপহাস করিবার কালে তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাইবেন "যেন কার্ত্তিক আর কি"। "গণেশ" "নন্দগোপাল" প্রভৃতি দেবনামগুলিও বাঙ্গালীর কাছে ঐরূপ অবজ্ঞা বা উপহাসবাচক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এপর্য্যন্ত যাহা দেখাইলাম তাহাতে পাঠক বুঝিলেন বঙ্গভাষায় দেবনামে শ্রদ্ধা অপেক্ষা অবহেলা অশ্রদ্ধা অনাদর ও অবজ্ঞার ভাবই বিশেষ ভাবে উঁকি মারিতেছে।

এই যে দ্যুলোকস্থ সূর্য্য চন্দ্র ইহারাও হিন্দুর দেবতা ; প্রকৃতির এই দুই দেবতাও বঙ্গভাষায় বিশেষ শ্রদ্ধা বা সমাদর লাভ করেন নাই। দেখ বেদে ঋষিমুখে সূর্য্য চন্দ্রের কি মহিমা কীর্ত্তিত ! আর বঙ্গের ছড়ায় তাহাদের কি অধোগতি কি দুর্দ্দশা ! সূর্য্য চন্দ্র প্রকৃতির এমন দুই সুন্দর বস্তুকেও বঙ্গের ছড়াকবিগণ মাতুল সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া সব মাটী করিয়া দিয়াছেন। সূর্য্য চন্দ্রকে মামা বলিলে উহাতে প্রকৃতির মহান সৌন্দর্য্যের ভাব দেবভাব কিছু থাকে না—কবিত্ব হৃদয় হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। বাঙ্গলার মাতুল সাম্বোধনে সূর্য্য চন্দ্রের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। "সূয্যি মামার বিয়েটা আয় রঙ্গ হাটে" "চাঁদা মামা টী দিয়ে যা" এই সকল ছড়া বঙ্গহৃদয়ের নিতান্ত লঘুতার পরিচায়ক। বঙ্গগৃহে মাতুল সম্পর্কটী পিতার ন্যায় গুরুগম্ভীর নহে, মাতুলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেকটা লঘুভাবের। মাতুলের সঙ্গে ভগ্নী-পুত্রের অভিমানটা গোষাকরাটা চলে, তাই ছড়াকবি গাহিয়াছেন—

তাই তাই তাই
মামার বাড়ী যাই
মামারা ভাত দিলে না গোষা ক'রে যাই।

বঙ্গদেশে সূর্য্যদেব বস্তুতই যে অবজ্ঞার চক্ষে হেয় চক্ষে দৃষ্ট হয়েন, হিন্দুর যজ্ঞোপবীতকালীন আচার প্রথা হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গে প্রসিদ্ধি আছে—যজ্ঞোপবীত কর্ম্মে শূদ্রবৎ সূর্য্যের মুখ দেখিতে নাই; সূর্য্য শূদ্রবৎ গণনীয়। সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় অন্যান্য গ্রহদেবতারাও বাঙ্গালীর হৃদয়ে কম বিরাগ-ভাজন নহে। ঋষিরা যে মঙ্গল গ্রহের এমন শুভ 'মঙ্গল' নাম দিলেন আমরা তাহাকে অমঙ্গলের আধার বলিয়া গণ্য করি এবং 'হাতে পাঁজী মঙ্গলবার' ইত্যাদি বাক্যে তাহার কুৎসা রটনায় ব্যস্ত। আর শনিগ্রহের ত কথাই নাই। দেবনামের সংস্পর্শ যাহাতে আছে, তাহাই দেখিতেছি কোন না কোনরূপে বাঙ্গালীর কাছে অসম্মানিত হইয়াছে। কামচারী নারদ ঋষির নামের সঙ্গে 'দেবর্ষি' উপাধি যুক্ত, তাই সেই নামও বুঝি কলহের কারণ রূপে বঙ্গীয় সমাজে গণ্য হয়। এই সঙ্গীতাচার্য্য উদারপ্রকৃতি

বীণাধারী ঋষির নাম লইয়া যখন কলহক্ষেত্রে লোকে 'নারদ নারদ' বলিয়া উপহাসের চীৎকার করে, তখন আমাদের লঘুচিত্ততার কথা সহজেই বদ্ধমূল না হইয়া যায় না।

বঙ্গভাষায় যে, দেবনামগুলি এমন অনাদরভাবে অবজ্ঞার ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার কারণ কি? তাহার একটী কারণ নহে। দেবনামে অনাদর শুদ্ধ একটী পথ দিয়া নহে, নানাপথ দিয়া, নানা ভাবের মধ্য দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম কারণ বাঙ্গালীর মুখে দেবনামের ছড়াছড়ি। বাঙ্গালী আলস্যসহকারে হাই তুলিবেন, তখনও 'হরিবোল' বলিবেন। বাঙ্গালী শুইতে যাইবেন তখনও তন্দ্রাবশে 'দূর্গানাম' লইবেন। এইরূপে বৃথা দেবনাম লইতে লইতে দেবনামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তি উদয় ছাড়া আর কি ফল হইতে পারে! কোথায় দেবনামের জন্য কঠোর তপস্যা সাধনা, আর কেথায় দেবনাম আলস্যের অঙ্গরূপে পরিণত! বাইবেল যথার্থই বলিয়াছেন "Thou shalt not take the name of the Lord

thy God in vain" অর্থাৎ "তোমরা বৃথা দেবনাম লইও না।" ইহা খৃষ্টীয় দশ ধর্ম্ম-শাসনের (Ten commandments) অন্যতম শাসন। সমাজে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য এবং তজ্জন্য উহাদিগের আত্মাভিমানও উহার দ্বিতীয় কারণ। ব্রাহ্মণেরা বঙ্গের ভূদেবতারূপে পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন—ক্রমে তাঁহারা দর্পভরে সেই দেবত্বপদ অধিকারে রাখিতে নিজেরাই সচেষ্ট হইলেন; তাহারই ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আপনাদিগকে 'দেবশর্ম্মা' নামে অভিহিত করিবার এক প্রথা প্রচলিত হইল। পত্রের বা লিপির নিম্নে নিজ নাম স্বাক্ষর করিবার কালে ব্রাহ্মণেরা 'অমুক চন্দ্র দেবশর্ম্মা' এইরূপ লিখিয়া থাকেন। এই রীতি নিতান্ত গর্ব্বসূচক ও হিন্দুব্রাহ্মণদিগের হীনতার পরিচায়ক। যে দেবতা তোমার ঈশ্বর বা পূজার সামগ্রী সেই 'দেব' নাম তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়া আত্মাভিমান চরিতার্থ কর কেন? ঋষিদিগের বংশসম্ভূত বলিয়া বরঞ্চ আপনাদিগকে 'ঋষিশর্ম্মা' বল 'মুনিশর্ম্মা' বল তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি' বলিয়া

নিত্য গায়ত্রী পাঠকালে যে দেব শব্দে প্রাণের দেবতা ভগবানকে পূজা কর, সেই নাম নিজনামের সহিত যুক্ত করিয়া 'দেবশর্ম্মা' নামে নিজেকে কলুষিত করা সামান্য পাপ নহে। অদ্বৈতবাদকে দেবনামে অশ্রদ্ধার তৃতীয় কারণ বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে গিয়া অদ্বৈতবাদী ক্ষুদ্র মানব, কেবল আপনাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না, তিনি অশ্ব গর্দ্দভ সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পান তাহাকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইতে কুণ্ঠিত হন না। অল্পদিন হইল একজন ঘোর অদ্বৈতবাদী স্পষ্টই দেখাইয়া বলিয়াছিলেন - "এই যে ঘোঁড়া গাধা দেখিতেছেন ইহারাও ঈশ্বর।" এই ভীষণ মত যখন দেশের লোকে সহজে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, তখন সেখান হইতে যে দেবভক্তি পলায়ন করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধার আরও একটী কারণ হিন্দুর বহু দেবতা—অসংখ্য দেবতা। সকল হৃদয়ে সকল দেবতা কিছু সমান সমাদর লাভ করিতে পারে না। যিনি, যে দেবতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন তদ্ভিন্ন অন্য দেবতার সম্বন্ধে তাহার সে শ্রদ্ধাভক্তি

হওয়া অসম্ভব, কাজেই ক্রমে অশ্রদ্ধা ও অনাদরে পরিণত হওয়া সহজ। এককালে ভক্ত মূসার প্রতি তাই পরমেশ্বরের দৈববাণী হইয়াছিল "I am the Lord thy God. Thou shalt not have strange gods before me." "আমিই তোমাদের এক ঈশ্বর। আমার সম্মুখে তোমরা নানা কল্পিত দেবতার উপাসনা করিও না।"

সকল দেবতার উপর যিনি তিনি এক পরমেশ্বর। "য একোঽবর্ণো" 'তিনি কোন জাতি বর্ণের অন্তর্ভূত নহেন।' আমরা তাঁহারি শরণাপন্ন হই। হৃদয়ের তুচ্ছভাব—দেবনামে অনাদর পরিহারের জন্য আইস আমরা সেই সকল দেবতার দেবতা এক ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হই এবং উচ্চৈঃস্বরে উপনিষদের ঋষিবাক্য ঘোষণা করিয়া বলি—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং
ভুবনেশমীড্যং ॥ *

* এই প্রবন্ধ সন ১৩১২ সালের আষাঢ় সংখ্যা পুণ্যে প্রকাশিত হয়।

কমলানেবু।

শীতকালে সকলেই কমলানেবু খাইয়া থাকেন। কমলানেবু হইতে আমাদের দেশে মোরব্বা, চাটনি প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হয়, এতদ্ভিন্ন অরেঞ্জসিরপ, মার্মালেড, অরেঞ্জেড প্রভৃতি নানাবিধ বিদেশী দ্রব্যও কমলানেবু হইতে প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে আমাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছে। এই সুন্দর স্বর্ণফল কমলানেবুর নামের বিষয় জানিতে অনেকেই উৎসুক হইবেন। কমলা ও অরেঞ্জ প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় নামগুলি কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল, কোথায় বা তাহাদের জন্মস্থান, এ সকল বিষয় জানিতে

* এই প্রবন্ধ সুহৃদসমিতির অধিবেশনে পঠিত ও ১৩০৪ সালের পৌষ সংখ্যা "পুণ্যে" প্রকাশিত হয়।

পারিলে বাস্তবিকই কমলানেবুর রসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও আনন্দ উপভোগ করা যায়।

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর ভারতের উত্তরে মধ্য আসিয়াকে আদি আর্য্য-গোষ্ঠীর প্রথম নিবাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে আদি আর্য্যগোষ্ঠী সেই মূল কেন্দ্রস্থান হইতে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে যে সংস্কৃত শব্দের সুসদৃশ অনেক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ তাঁহারা বলেন মধ্য আসিয়ার আদি আর্য্যভাষা; তাঁহাদের মতে এই মূল আর্য্যভাষা হইতে সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষাসমূহ জন্ম লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই আর্য্য ভাষা, আমাদিগের বোধ হয় ভারতেরই শিরোভাষা—ইহাই বৈদিকী ভাষা; ইহা পরিমার্জ্জিত হইয়াই সংস্কৃত ভাষায় পরিণত। এই দেবভাষার আশ্রয়ে পৃথিবীর নানাভাষা যে সুসভ্য আর্য্যভাষায় পরিণত হইয়াছে, ইহার নিকটে অনেক

ভাষাই যে বিশেষরূপে ঋণী তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বহুপূর্ব্বাবধি ভারত দেশবিদেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান ছিল সেইরূপ ভারতের ভাষাও সকল ভাষার মধ্যবিন্দুস্বরূপ ছিল। সংস্কৃত ভাষা, যে, সকল আর্য্যভাষার শিরস্থানীয় তাহা ফলমূল সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারাও অনেকটা প্রতিপন্ন হইবে।

ভারতের অরণ্যবাসী ঋষিরা যখন একটী দুইটী করিয়া ফলমূল আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগের উপযোগী নামগুলি একে একে উদ্ভাবন করতঃ ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন, তখন ভারতের অরণ্য হইতে আসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডের নানা দেশে যে কিরূপে তাহা প্রচারিত হইল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বুঝা যায় যে বনবাসী ঋষিদিগের সাধনার ফল শুদ্ধ যে তাঁহাদের স্বদেশবাসীগণ ভোগ করিতেছেন তাহা নয়, কিন্তু দূরাগত পথিকের ন্যায় বহুদূরস্থ বিদেশীয়গণও তাহার ফললাভে বঞ্চিত নহে।

জগদ্বিখ্যাত কমলানেবু কিছু মধ্য আসিয়া বা হিমালয়জাত ফল নহে যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা

স্থির করিয়া বসিবেন যে, কমলানেবুর নাম মধ্য আসিয়াবাসীদিগের আদি আর্য্যভাষায় প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া উহা জগতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় কমলানেবুর জন্মস্থান প্রকৃতপক্ষে ভারতের মধ্যপ্রদেশ। মধ্যভারত কমলানেবুর জন্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। যখন উত্তর প্রদেশবাসী আর্য্যেরা হিমাচল হইতে অবতরণ করিয়া ভারতের নিম্নভূমিতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ভারতের মধ্যপ্রদেশ তাঁহাদিগের সমক্ষে যে সকল নূতন নূতন দ্রব্যসমূহ উপহার স্বরূপে আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কমলানেবু সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হউক একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী যে বটে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সেই প্রাচীনকালে মধ্য-ভারত নাগলোক নামে খ্যাত ছিল। এখনও আমরা তাহারই চিহ্নস্বরূপ নাগ-পুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি নামগুলি দেখিতে পাই। মধ্য-ভারতকে নাগলোক নামে অভিহিত করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। সংস্কৃত 'নাগ' অর্থে পর্ব্বত,

হস্তী, সর্প ও জাতি বিশেষের নাম বুঝায়। "অগি সঞ্চলনে" অগ ধাতুর অর্থ সঞ্চলন, 'ন' ও 'অগ' দুইটি শব্দের যোগে 'নাগ' শব্দের উৎপত্তি। অথবা 'ন'+'গ' (গম) শব্দের যোগে 'নাগ' হইয়াছে। যাহা সঞ্চলন করে না মূল শব্দার্থ হিসাবে তাহাই প্রথম নাগ নামের যোগ্য; পর্ব্বত সঞ্চলন করে না, তাই পর্ব্বতের আরেক নাম নাগ। হস্তী ও সর্প প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রধানতঃ বিচরণ করে বলিয়া উহারাও ক্রমে পর্ব্বতের নামে 'নাগ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যে জাতি মধ্য-ভারতের অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে হস্তী ও সর্পের ন্যায় বিচরণ করিত তাহারাও 'নাগ' নামে খ্যাত না হইয়া যায় নাই। মধ্য-ভারত প্রধানত পার্ব্বত্যপ্রদেশ বলিয়া নাগলোক, মধ্য-ভারত সর্প ও হস্তীর আবাসভূমি ছিল বলিয়া নাগলোক, আবার মধ্য-ভারত পার্ব্বত্য নাগ জাতির আবাসভূমি ছিল বলিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট নাগলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই নাগলোকে প্রচুর পরিমাণে কমলানেবু জন্মিত

বলিয়া ঋষিরা কমলানেবুর নাম 'নাগরঙ্গ' দিয়াছেন। নাগলোক বা নাগ প্রদেশ রঞ্জিত করিয়া থাকে বলিয়াই "নাগরঙ্গ" নাম হইয়াছে। এক্ষণেও সেই পুরাকালের স্থায় নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশ নাগরঙ্গের স্বর্ণবর্ণে শোভান্বিত হইতে দেখা যায়। এই 'নাগরঙ্গ' নাম বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। সংস্কৃত প্রাচীনতম বৈদ্যকগ্রন্থ চরকে নাগরঙ্গের গুণাগুণ পর্য্যন্ত লিখিত আছে—

মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনং।
দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গ ফলং গুরু॥

(চরক)

"নাগরঙ্গ" ফল মধুর, কিঞ্চিদম্ল, অন্নে রুচি আনয়নকারী, দুর্জ্জর (সহজে জীর্ণ হয় না), বাতনাশক ও গুরুপাক।"

আরো একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে ভারতের মধ্য প্রদেশের স্থায় ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল আসাম প্রদেশও কেবল যে কমলানেবুর জন্ম সুপ্রসিদ্ধ তাহা নয়, আসামভূমি নাগপুর প্রদেশের স্থায় পার্ব্বত্যপ্রদেশ বলিয়া এবং

হস্তী, সর্প ও নাগজাতির নিবাসস্থান বলিয়াও সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন পৌরাণিক নাগজাতির অবশেষ আমাদিগের বিশ্বাস এখনো ভারতে 'নাগা'জাতিরূপে বিদ্যমান। খুব সম্ভব জনমেজয়ের নাগযজ্ঞের পর অবশিষ্ট নাগকুল আর্য্যাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পলায়ন করিয়া দূরবর্ত্তী আসামের অরণ্যসঙ্কুল গিরি-গুহায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে ভারতের যে যে অংশে নাগেরা প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেই সেই অংশ "নাগরঙ্গের" রঙ্গক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যেমন আমাদের দেশে ইংরাজজাতির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উদ্যানে বিলাতী তরুলতাও রোপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ সম্ভবতঃ নাগেরা যেদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দেশে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের জন্মভূমির 'নাগরঙ্গ' রোপণ করিতে ভুলে নাই। গ্রিসীয় পৌরাণিক আখ্যানের দ্বারাও আমাদের এ কথা বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে দেখা যায়। সুপণ্ডিত পামার সাহেব বলেন **"The sanskrit naranga contracted from "naga-ranga" (naga a serpent or snake**

and ranga a bright colour), is suggestive of the Dragon guarded golden apples of the Hesperides, the kingdom of the nagas.” অর্থাৎ গ্রিসীয় পুরাণে সর্পরক্ষিত স্বর্ণফলের যে আখ্যান আছে, তাহা ইঙ্গিতে নাগরক্ষিত স্বর্ণফল নাগরঙ্গের প্রতিই সম্ভবতঃ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। বাঙ্গলায় নাগরঙ্গকে যে কমলানেবু বলিয়া থাকে তাহার কারণ সম্ভবতঃ আসামের কুমিল্লা প্রদেশ; কুমিল্লা সিলেট প্রভৃতি স্থান হইতেই কলিকাতা অঞ্চলে কমলানেবু অধিক পরিমাণে আনীত হয়। ‘কুমিল্লা’ হইতে ‘কমলা’ নাম আসা কিছু আশ্চর্য্য নহে। অথবা দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া অরুণ-বরণা লক্ষ্মীর নামে ‘কমলা’ নাম হইতে পারে।

য়ুরোপ ও আসিয়ার অধিকাংশ ভাষায় কমলানেবুর নাম সংস্কৃত ‘নাগরঙ্গ’ শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। য়ুরোপখণ্ডের সকল ভাষাতেই প্রায় কমলানেবুর নাম সংস্কৃত ‘নাগরঙ্গ’ হইতে উৎপন্ন দেখা যায়—স্প্যানিশ ভাষায় ‘নারাঞ্জা’ (Naranza), ভিনিশীয় ভাষায়

'নারাঞ্জা (Naranza), গ্রীক ভাষায় 'নেরাঞ্জী' (Neranzi) বলে। এই শব্দগুলি সংস্কৃত 'নাগরঙ্গ' শব্দেরই অপভ্রংশ ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের স্বদেশেও 'নায়াঙ্গা' শব্দ বহু প্রচলিত আছে। এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থেও 'নাগরঙ্গ' শব্দ সংক্ষিপ্তাকার প্রাপ্ত হইয়া 'নারঙ্গ' রূপ ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। পারস্য ভাষায় 'নাগরঙ্গ'কে 'নারাঞ্জ' (Naranj) এবং আরবি ভাষায় 'নেরাঞ্জ' বলিয়া থাকে। এক্ষণে পাঠক দেখুন এক সংস্কৃত 'নাগরঙ্গ' শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া কেমন 'নারাঞ্জ' ইত্যাদি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। "নাগরঙ্গ" যে সকলের মূলে তাহা বোধ করি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ইংরাজী 'অরেঞ্জ' (Orange) শব্দটীও যে নাগরঙ্গকুলোদ্ভূত তাহা এক্ষণে দেখাইতেছি। ভাষাতত্ত্বের নিয়মালোচনায় জানা যায় যে নকারাদি শব্দ অনেক সময় ভাষান্তরে প্রবেশকালে আদ্যক্ষর নকার পরিত্যাগ করিয়া যায়, কেবল স্বরবর্ণটী বজায় থাকে

মাত্র। এই নিয়মে ফরাসী 'নাপরঁ' (Naperon) শব্দ ইংরাজীতে 'আপ্রন' (Apron) হইয়াছে, নকারের লোপ হইয়াছে।* ইংরাজী 'আমপয়র' (Umpire) শব্দও প্রাচীন ফরাসী 'নমপেয়র' (Nompair) শব্দ হইতে উৎপন্ন।* এই যেমন দেখাইলাম 'নাপরঁ' ও 'নমপেয়র' শব্দদ্বয় হইতে 'আপ্রন' ও 'আমপায়র' শব্দদ্বয়ের উদ্ভব, এই একই নিয়মে 'নাগরঙ্গ' হইতেও 'নারঙ্গ' ও 'নারাঞ্জ' এবং পরে ন লোপ হইয়া ইংরাজী 'অরেঞ্জ' (Orange) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ফরাসী ভাষায় কমলানেবুকে ইংরাজীর অনুরূপ 'অরাঁজ' (Orange) ও লাটিনে 'অরাঞ্জিয়া' বলে।

জর্ম্মণ ভাষায় কমলানেবুর নাম 'পমারাঞ্জ'

---

* Umpire, old English Owmpere an incorrect form of a Nowmpere or nompeyre, from old French Nompair. Folk Etymology.

* 'Napron is the form found in old English from old French 'Naperon', a large cloth. Folk Etymology.

(pomerantz)। 'পমারাঞ্জ' শব্দ একটী শব্দ নয়, দুইটী বিভিন্ন শব্দের যোগে 'পমারাঞ্জ' শব্দের সৃষ্টি : 'পমা' অর্থে ফল ও 'অরাঞ্জ' অর্থে কমলানেবু। ইংরাজী 'পমগ্রানেট' (দাড়িম) শব্দেও ফলার্থ বাচক 'পমা' শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায়। ভারতীয় ভাষায় যে 'মেওয়া বা 'মোয়া' শব্দে পক্ব মধুর ফল বুঝায়, য়ুরোপীয় 'পমা' শব্দটীকে তাহারি জ্ঞাতিশব্দ বলিয়াই মনে হয়। 'মেওয়া' বা 'মোয়া' শব্দ ফলের সাধারণ নাম, এই কারণে বাদাম, পেস্তা, কিশ্মিস্ প্রভৃতি সুমিষ্টফল 'মেওয়া' নামে সচরাচর অভিহিত হয়। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় 'সবুরে মোওয়া ফলে' বলিয়া যে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেখানেও 'মোওয়া' অর্থে মিষ্ট পক্কফল। 'মোয়া' শব্দটী সংস্কৃত 'মোদক' শব্দ হইতে উদ্ভূত।† রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও 'মোদক' শব্দের অভাব দেখা যায় না—

† বদন শব্দ হইতে যে নিয়মে "বয়ান" হইয়াছে 'পদ' বা "পাদ" শব্দ হইতে যে নিয়মে "পায়া" হইয়াছে, সেই নিয়মে 'মোদক' শব্দেরও 'দ' 'য়'তে পরিণত হইয়া 'মোয়া' রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

"নারাজকে জনপদে মাল্যমোদকদক্ষিণাঃ।
দেবতাভ্যর্চ্চনার্থায় কল্প্যন্তে নিয়তৈর্জনৈঃ॥" *

"অরাজক দেশে লোকেরা দেবতারাধনার্থ মাল্য মোদক ও দক্ষিণা কল্পনা করেন না"

এই সংস্কৃত মোদক শব্দ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় 'মেওয়া' 'মোয়া' প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে "মুদী" প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি। যাহা মোদন করে তাহাই মোদক, এই অর্থে মিষ্ট ফলও মোদক, সুমিষ্ট নাড়ুও মোদক, এমন কি সুমিষ্ট ঔষধের নামও সংস্কৃত ভাষায় মোদক হইয়াছে। এই মোদক শব্দেরই অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত 'মেওয়া' বা 'মোয়া' শব্দেও বাদাম পেস্তা প্রভৃতি ফলকে বুঝায়, আবার সুমিষ্ট নাড়ু ও ডেলাক্ষীর প্রভৃতিকেও বুঝায়। পুরাকাল হইতেই বাণিজ্য প্রভৃতি নানা-সূত্রে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ কেন, সংস্কৃত-প্রসূত আমাদের দেশের অনেক প্রাকৃত শব্দও য়ুরোপের উপকূলে

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭ সর্গ।

উপনীত হইয়াছে দেখা যায়। নারাঙ্গা শব্দের ন্যায় মোদকোৎপন্ন প্রাকৃত 'মোয়া' শব্দটীরও এইরূপে ভারত হইতে য়ুরোপে গিয়া কিঞ্চিৎ বেশ পরিরর্ত্তিত করিয়া 'পমা' রূপ ধারণ করা কিছু অসম্ভব নহে। প, ফ, ব, ভ, ম ভাষাবিজ্ঞানে এই অক্ষরগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত সখ্য আলিঙ্গনে বদ্ধ। ইহারা পরস্পর পরিবর্ত্তসহ, যেমন আমরা 'আম' এর "মকে" "ব" করিয়া অনেক সময়ে 'আব' উচ্চারণ করি, যেমন সংস্কৃত 'আত্মন' শব্দের 'ম' স্থানে 'প বা 'ব' আসিয়া বাঙ্গলায় 'আপনি'ও হিন্দিতে 'আব' বা 'আপ' গঠিত হইয়াছে। এই কারণে "ময়া" যে "পমা" হইতে পারে ইহা সহজেই অনুমিত হয়। মোয়া = মবা = পঁবা = পমা।

আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম যে কমলানেবু সম্পর্কীয় নামগুলি আমাদেরই দেশ হইতে গিয়া নানা দেশে উপনিবেশ করিয়াছে। এক্ষণে কমলানেবু সম্বন্ধে আরেকটী বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কমলানেবু প্রভৃতি অনেকগুলি নেবুই য়ুরোপীয় উদ্ভিদশাস্ত্র মতে সাইট্রস (citrus) জাতির

অন্তর্ভূত। বিজ্ঞানে এই "সাইট্রস" শব্দের অনেক ব্যবহার আছে; ইহা হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা সাইট্রিক (citric) প্রভৃতি নানা শব্দ সংগঠন করিয়াছেন। এই সাইট্রস শব্দটী কোথা হইতে আসিল? ইহার মূল কোথায় দেখা যাউক। সংস্কৃত ভাষায় নেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের নাম 'দন্তশঠ'। অম্লদ্রব্যের নাম 'দন্তশঠ' এইজন্য যে অম্লদ্রব্য দন্তের প্রতি শঠতা আচরণ করে। দাঁত টকিয়া যায় বলিয়া 'দন্তশঠ' নাম; এই কারণে নেবু কপিত্থ, তেঁতুল প্রভৃতি প্রায় সকল অম্লদ্রব্যই "দন্ত-শঠ" নামে খ্যাত।

"দন্তশঠঃ জম্বীরঃ কপিত্থশ্চ
দন্তশঠা অম্লিকা চাঙ্গেরীচ।"

'দন্তশঠ' আবার সংক্ষিপ্ত হইয়া 'শঠ'রূপে পরিণত হইয়াছে। অম্লরসে দাঁত টকিয়া যায় বলিয়া অম্লরসেরও নাম এমন কি সংস্কৃত'শঠ'। এই সংস্কৃত 'শঠ' শব্দই কি 'সাইট্রস' প্রভৃতি শব্দের মূল নহে? * হিন্দিতে

* সাইট্রিক প্রভৃতি শব্দের অনুবাদ আমার মনে হয় 'শঠ' শব্দ হইতে করাই সঙ্গত।

টক্‌কে যে 'খট্টা' বলে তাহারও মূল এই 'শঠ' শব্দই। হিন্দিতে 'শ' বা 'ষ' 'খ'র ন্যায় উচ্চারণ হয়, তাই সংস্কৃত 'শঠ' হিন্দিতে 'খট্টা'রূপে পরিণত হইয়াছে। অম্ল খাইবার পর জিহ্বার দ্বারা আমরা যে 'টক'শব্দ করি' তাহাই বাঙ্গালায় অম্লের "টক" নাম হইবার কারণ। নাগরঙ্গ শব্দের ন্যায় 'শঠ' শব্দও অপভ্রষ্টাকারে ভারতের নানা ভাষায় কমলার জাতীয় নেবুকে বুঝায় ;— যেমন দাক্ষিণাত্যে 'নারাঙ্গী শন্ত্রা' বলে, পশ্চিমে 'শন্তর' আসামী ভাষায় 'শুন্তিরা' বলিয়া থাকে। ইহারা সকলেই এক শঠ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইংরাজীতে বড় এক জাতীয় নেবুর নাম সাইট্রন (citron), জর্ম্মন ভাষায় (citron) বলিতে নেবু মাত্রকই বুঝায়। য়ুরোপীয় "সাইট্রন" প্রভৃতি শব্দের সহিত ভারতীয় 'সন্তর' প্রভৃতি শব্দের যে বিশেষ সাদৃশ্য, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—উহাদের আকৃতিতেই বুঝা যায় যে উহারা একই গোষ্ঠীর। উহাদের সকলের মূলে যে এক সংস্কৃত 'শঠ' শব্দ বিরাজ করিতেছে তাহাতেই উহাদের মধ্যে এতটা ঐক্য। 'শন্তর' প্রভৃতি শব্দ

যে 'শঠ' শব্দেরই অপভ্রংশ ইহা আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারি যখন দেখি যে 'ধূর্ত্ত' অর্থ-বোধক শঠ শব্দ, হিন্দুস্থানীতে 'শণ্ঠ' এইরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। শঠ হইতে যদি 'শণ্ঠ' হইতে পারিল ত 'শন্তর'ইবা না হইবে কেন ?

ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে চালিত হইয়া তাহাই আবার পরিবর্ত্তিত আকারে যেমন আমাদের নিকট চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হয়, ভাষা সম্বন্ধেও কি তাহাই হয় নাই ? ভারতের ভাণ্ডার হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া এক সময়ে বিদেশীয় ভাষাগুলি বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দগুলির বিদেশীয় সংস্করণ আমরা চতুর্গুণ মূল্যে ফিরিয়া পাইতেছি। আমাদের সংস্কৃত নাগরঙ্গ, শঠ প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্বই হয়ত আমরা জানি না, কিন্তু অরেঞ্জেড, citric প্রভৃতি শব্দগুলি বহুমূল্য ভাবিয়া আমরা কতই না যত্নে কণ্ঠস্থ করিয়াছি।

গণেশ-বাহন ইঁদুর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ও ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল।

হিন্দুর যতগুলি দেবতা, বোধ হয় ততগুলি বাহনও আছে। তেত্রিশ কোটী দেবতার বাহনের গুরুভার কার্য্য হইতে আলিপুরের প্রাণীবাটিকার অল্প জানোয়ারই রেহাই পাইয়াছে। কতকগুলি বাহনের নাম করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ইহার মধ্যে কেমন বেশ বৈচিত্র্য আছে। যেমন দুর্গার বাহন সিংহ, গণেশের বাহন ইঁদুর, অগ্নির বাহন ছাগল, কার্ত্তিকের বাহন ময়ুর, শীতলার বাহন গর্দ্দভ, ব্রহ্মার বাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, গঙ্গার বাহন মকর, শিবের বাহন বৃষ, যমের বাহন মহিষ, ষষ্ঠীর

মূষিক বাহন গণেশ

বাহন বিড়াল, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, মঙ্গলের বাহন ভেক, শনির বাহন শকুনি, কেতুর বাহন মুর্গী, ইত্যাদি। অল্পদিন হইল কোন কবি 'রসগোল্লা'কে নাকি দেবীরূপে কল্পনা করিয়া শালপত্রকে তাঁহার বাহন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বামনপুরাণে যে দেবগণের বাহনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে তাহার আভাস না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও এস্থলে অতি অল্পসংখ্যক দেবগণেরই বাহনের বিষয় বলা হইয়াছে—"পুলস্ত্য দেবর্ষিনারদকে বলিলেন, দেবরাজের বাহন মহাগজ ঐরাবত; ঐ ঐরাবত মহাবীর্য্য ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন এবং শ্বেতবর্ণসম্পন্ন। ধর্ম্মরাজের বাহন পৌণ্ড্রক নামক মহিষ ঐ মহিষ অতীব ভয়ঙ্কর ও কৃষ্ণবর্ণ। বরুণের বাহন দিব্যগতি শ্যামবর্ণ শিশুমার। কুবেরের বাহন অম্বিকার পাদসম্ভূত নরোত্তম; উঁহার আকৃতি শৈলের ন্যায় এবং উঁহার লোচন শকটচক্রের ন্যায়, উঁহার প্রকৃতিও অতীব ভয়ঙ্কর, একাদশ রুদ্রের বাহন সুরভির অংশে জাত উগ্রবেগসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ বৃষ সকল। চন্দ্রমার বাহন হংস। অশ্ব,

উষ্ট্র ও রথ আদিত্যগণের বাহন। বসুগণের বাহন হস্তী। যক্ষেরা নরবাহন। কিন্নরগণের বাহন সর্প। অশ্বিনীকুমারের বাহন ঘোটক। মরুদ্গণের বাহন সারঙ্গ এবং কবিগণের বাহন শুক।" *

সময়ে সময়ে সুযোগ পাইলে এই বাহনগুলা লোকের উপর বড় কম উৎপাত উপদ্রব করেনা। প্রবল প্রতাপ জমীদারের নায়েবের উপদ্রবে যেমন নিরীহ প্রজারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত, দেবতার কোন কোন বাহনের উপদ্রবে তেমনি সকলে অস্থির।

যে সকল বাহন লোকের উপদ্রবকারী, গণেশবাহন মূষিক তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি যেমন একটা ঘোরতর দৈব বিপদ, সেইরূপ মূষিকও একটী ঘোরতর দৈব বিপদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভাঃ মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃস্মৃতাঃ॥

"অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ (পঙ্গপাল জাতীয় পতঙ্গ), ইঁদুর, ধান্যনষ্টকারী পাখী ও রাজার সমাগম

* বামনপুরাণ ৯ম অধ্যায়।

এই ছয়টী বিষয় লোকের পক্ষে ঈতি বা উৎপাৎ বলিয়া গণ্য হয়”

ইঁদুরের সংস্কৃত নামগুলি ইদুরের স্বভাবের পরিচায়ক। ইঁদুর যে উপদ্রবকারী, মূষিক নামেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মূষ ধাতুর অর্থ ডাকাতি করা বা চুরি করা। বাঙ্গালার ‘দেঁড়ে মুষে’ কথার মধ্যে এই ‘মুষে’ শব্দটি সংস্কৃত ‘মূষ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থে “দস্যুভির্মূষিতস্য” অর্থাৎ ‘ডাকাত কর্তৃক অপহৃত’ ইত্যাদি প্রয়োগের অভাব নাই। * মূষ ধাতুর অর্থ ‘আঘাত করা’ও হয়—যাহা হইতে ‘মূষল’ অর্থাৎ মুগুর কথাটি আসিয়াছে। বাঙ্গালার “দুর্মূষ” শব্দটিও মূষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইঁদুরের ‘উন্দুর’ সংস্কৃত নামটিও বড় সুখ্যাতির পরিচায়ক নহে। উন্দি ক্লেদনে। ‘উন্দ’ ধাতুর অর্থ ক্লেদন অর্থাৎ “নোঙ্গরা করা।” ইঁদুর যে কিরূপ ঘর নোঙ্গরা করে তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এই নোঙ্গরামি অপেক্ষা সেকেলে

* মুষ্টি ও মূষা (সোণা গালাইবার পাত্র মুচী) শব্দদ্বয়ও এই অপহরণার্থক মুষ ধাতু হইতেই আসিয়াছে।

গৃহের ধান্যাদি নষ্ট বা অপহরণ করা বিশেষ অনিষ্টজনক বিবেচিত হইত বলিয়াই প্রাচীনকালে ইঁদুরের এই 'মূষিক' নামটি সংস্কৃত ভাষা হইতে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। যেমন ইংরাজীতে Mouse বলে ইত্যাদি—ইহা সংস্কৃত মূষিক বা মূষক শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। অপরিচ্ছন্নতার সহিত যে ইঁদুরের কিরূপ মাখামাখি ভাব তাহার চিত্র রামায়ণ হইতে দেখুন—

"রজসাভ্যবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ।
মূষকৈঃ পরিধাবদ্ভি রূদ্বিলৈরাবৃতানি চ॥"

"যে সকল গৃহ অমার্জিত, রজঃপরিব্যাপ্ত, দেবগণ পরিত্যক্ত, গর্ত্ত হইতে উত্থিত ইতস্তত ধাবমান মূষিক-সমূহে সমাবৃত, কৈকেয়ী সেই সমস্ত গৃহ প্রাপ্ত হউন।" *

কিন্তু এই প্লেগের প্রকোপের সময়ে মূষক অপেক্ষা উন্দুর নামটি দেখিতেছি অধিক ভয়ের কারণ। কেন

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৩৩ সর্গ।

না নোঙ্গরামি প্লেগের দ্রুত প্রচারে সহায়। পরিচ্ছন্নতা প্লেগের প্রতিষেধক। এখন যেমন প্লেগের জন্য ইঁদুর-কুল ধ্বংস করিবার কথা হইতেছে সেইরূপ পুরাকালেও ইঁদুরবংশ-ধ্বংসের জন্য নানা চেষ্টা হইয়াছিল। সেকেলে এই মহামারীর ভয়ে যে লোকে ইঁদুরের উপর বিরক্ত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ইঁদুর যে নানারূপে লোকের উৎপাত করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁদুরের উপদ্রব লোকের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁদুর গণেশবাহন হইলেও প্রাচীন কালে এই ইঁদুরকুল নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা না হইয়া যায় নাই। একে জীবহত্যা হিন্দুর পাপ, তায় ইঁদুর আবার দেবতা গণেশের বাহন; তাই এমনিটি উপায় করা চাই যে ইঁদুরকুলও ধ্বংস হয় অথচ ইঁদুর হত্যা পাপ স্পর্শ না করে। ইঁদুরের শত্রু কে? ইঁদুরের ভক্ষক কাহারা? হিন্দু খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই সকল প্রাণীকে সমাদর পূর্ব্বক গৃহে ডাকিয়া আনিয়া দেবতার বাহন করিয়া দিলেন। পেঁচা ও বিড়াল ইঁদুরের পরম শত্রু—তাহারা ইঁদুর ভক্ষক, তাই হিন্দু একটিকে (পেঁচাটিকে)

লক্ষ্মীর বাহন ও আরেকটিকে (বেড়ালটিকে) ষষ্ঠীর বাহন করিয়া দিলেন। এইরূপে এক দেবতার বাহনকে অপর দেবতার বাহন দ্বারা সমূলে বিনাশ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন: একটি ইঁদুরের বিপক্ষে দুই দুইটি শত্রু পেঁচা ও বেড়ালকে নিযুক্ত করিয়া নিরাপদ হইলেন।

পেঁচা ও বিড়াল যে পুরাকালে বড় শুভসূচক বলিয়া গণ্য হইত তাহা মনে হয় না। রামায়ণে আছে—দশরথের মৃত্যুর পরে রামের বনবাস সংঘটিত হইলে যখন ভরত শূন্যপুরী অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন, তখন সেই তিমিরাচ্ছন্ন পুরীতে অলক্ষণসূচক বিড়াল ও পেচকেরা বিচরণ করিতেছে এবং গৃহকবাট সকল রুদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন—

"স্নিগ্ধ গম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপযান্ প্রভুঃ।
অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥
বিড়ালোলুকচরিতা মালীননরবারণাম।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব।"*

* রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৪ সর্গ।

পেচক-বাহন লক্ষ্মী

কিন্তু অলক্ষণসূচক হইলেও কার্য্য উদ্ধারের জন্য কালক্রমে উহারা গৃহে গৃহে দেবতার বাহনরূপে আদর পাইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস লক্ষ্মীপেঁচা ঘরে আসিলে লক্ষ্মী প্রসন্না হ'ন অর্থাৎ খুব টাকাকড়ি হয়। এ বিশ্বাসের মূল কি? লক্ষ্মীপেঁচা আসিলে তাহার সঙ্গে কি ধনসম্পত্তি লইয়া আসে তাহা নয়। প্রকৃত কথা এই যে লক্ষ্মীপেঁচা ঘরে আসিলে তাহার খাদ্য ইঁদুরের অনুসন্ধানে আসে। ইঁদুর মরিলে গৃহের বা ক্ষেত্রের ধান্যাদি নষ্ট করিতে পারে না। লক্ষ্মীপেঁচা সচরাচর ধান্যক্ষেত্রেই থাকে। ধান্যাদিই গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ। এই কারণেই লক্ষ্মীপেঁচা লক্ষ্মীর বাহনরূপে পরিগণিত। কিছুকালপূর্ব্বে সম্বাদপত্রে পড়া গিয়াছিল যে প্লেগের ভয়ে ইঁদুরকুল ধ্বংস করিবার জন্য আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে পেঁচা পুষিবার প্রস্তাব হইতেছে। আমরাও এই মহামারী ও দুর্ভিক্ষের সময়ে লক্ষ্মীর বাহনকে গৃহে গৃহে আবাহন করিলে মঙ্গল।

বেড়াল যে বড় শান্ত শিষ্ট প্রাণীটি তাহা নহে। এই বিড়াল তপস্বীরা সুযোগ পাইলে গৃহস্বামীকে তিতিবিরক্ত

করিয়া তুলে, সম্মার্জ্জনী প্রহারে তবে সে পাপের প্রায়-শ্চিত্ত হয়। কিন্তু তথাপি বেড়ালকেও যে হিন্দু ষষ্ঠী-ঠাকুরাণীর বাহন করিয়া গৃহে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছেন, তাহার কারণ বেড়াল ইঁদুরের পরম শত্রু। হিন্দুর বিশ্বাস মা ষষ্ঠীর কৃপায়, বর্ষার দুর্ব্বাদলের ন্যায় কচিমুখ শিশুগুলি গজাইয়া উঠে এবং গৃহটিকে শ্যামল করিয়া তুলে। তাই পুত্রাদির মুখে কখন মৃত্যু কি কোনরূপ অশুভজনক বাক্য শুনিলেই জননী তাড়াতাড়ি ষষ্ঠীকে সুপ্রসন্ন করিবার জন্য বলিয়া উঠেন--"বালাই, ষাঠ ষাঠ ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস।" 'বালাই' শব্দটী বিপদ-সূচক। বালাই শব্দটীর উৎপত্তি সংস্কৃত "বালগ্রহ" হইতে। এই "বালাই" হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ষষ্ঠীর কাছে কৃপা ভিক্ষা। দুইবার ষাঠ ষাঠ শব্দে ষষ্ঠীর নামোচ্চারণ, তৎপরে ষষ্ঠীর বৎস ও ষষ্ঠীর দাস বলিয়া তবে নিরস্ত। পুত্র জন্মাইবার পরে ছয় দিনের দিন যে গৃহিণীরা ষেঠেরা করিয়া থাকেন তাহাও ষষ্ঠীপূজা।

এখন দেখা যা'ক এই ষষ্ঠীর মূল কোথায় সম্বদ্ধ। পূর্ব্বে রাজারা প্রজার নিকট হইতে যে, উৎপন্ন শস্যের

বিড়াল-বাহন ষষ্ঠী

ষষ্ঠভাগ করস্বরূপে গ্রহণ করিতেন সেই ষষ্ঠাংশের সঙ্গে ষষ্ঠীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। * সেই ষষ্ঠাংশেরই একরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী। কার্ত্তিক মাসে যখন ধান্যাদি ওষধি সমূহ পরিপক্কতা লাভ করে তখনই রাজার করস্বরূপে শস্যের ষষ্ঠাংশ প্রদানের প্রকৃত কাল। এই সময়ে প্রজাবৃন্দ —আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই, আনন্দগদ্গদচিত্তে রাজাকে ষষ্ঠভাগ প্রদানার্থ এবং অবশিষ্টভাগ গৃহে আনয়নের জন্য ক্ষেত্রে ধান্যাদি কর্ত্তন করিতে যায়। তাই এই ধান্যাদি কর্ত্তনের অধিষ্ঠাতৃদেব কার্ত্তিক ষড়ানন এবং ষষ্ঠাংশের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কার্ত্তিকের সহচরী ষষ্ঠী নামে খ্যাত। পুরাণে ষষ্ঠীদেবী প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপা বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

"ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
পুত্রপৌত্র প্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী॥" †

পুনশ্চ—

* ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ। (কালিদাস)

† ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১ অধ্যায়।

মাতৃরূপা দয়ারূপা শশ্বদ্রক্ষণরূপিণী।

সেকালে রাজারা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিতেন প্রজা-রক্ষা প্রজাপালনের জন্য। ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজা-পালন না করা তাঁহাদের নিকট মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। নিম্নোদ্ধৃত ভরতবিলাপ হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।—

"বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য নৃপস্যারক্ষিতুঃ প্রজাঃ।
অধর্ম্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥" ‡

"আর্য্য রাম যাঁহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা না করিলে রাজার যে পাপ হয় সেই ব্যক্তির সেই পাপ হউক।"

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ ও প্রজারক্ষণ এই দুইটী যেন একযোগে বদ্ধ। তাই শাস্ত্রে ষষ্ঠাংশের দেবী ষষ্ঠীকে রক্ষণরূপিণী বলা হইয়াছে। কার্ত্তিক মাস যে ধান্য কর্ত্তনের কাল, কার্ত্তিকের নক্ষত্রের নাম কৃত্তিকাও তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই "কৃত্তিকা" নক্ষত্রের নামও কর্ত্তন বা ছেদনার্থ কৃৎধাতু হইতে

‡ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৫ সর্গ।

উৎপন্ন। নক্ষত্রের নামগুলি সময়ের উপযোগী করিয়া রাখা হইয়াছে। যেমন বৈশাখ মাসের নাম "বিশাখা" নক্ষত্র হইতে। "বিশাখা"র অর্থ বিগত শাখা; বৈশাখের ঝড়ে বৃক্ষসমূহ ভগ্নশাখ হয় বলিয়াই এই নাম।

পুরাণকার বটবৃক্ষের মূলে ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া পূজা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।* কিন্তু এই পূজার জন্য বড় একটা কষ্টকল্পিত মূর্ত্তির আবশ্যক করে না। বটমূলস্থিতা ষষ্ঠীদেবীর প্রত্যক্ষ চিত্র আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। শরতের কার্ত্তিকে যখন পুত্র-পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বটমূলে সুন্দরী কুলবধূকে আনন্দগদ্গদচিত্তে শস্য-সংগ্রহে ব্যস্ত দেখা যায়, তখনই ষষ্ঠী দেবীর চিত্র চিত্তে আপনা হইতেই প্রতিভাত না হইয়া যায় না।

এই কার্ত্তিক মাসে যেমন শস্যের প্রাচুর্য্যবশতঃ একদিকে জনসাধারণের আনন্দ, সেইরূপ অন্যদিকে নানারূপ অস্বাস্থ্যকর জ্বরাদির প্রাদুর্ভাবের কারণে সকলের বিশেষ

* দেবী ভাগবত নবম স্কন্ধ।

চিন্তার বিষয়। এই ধান্য কর্ত্তনের কালে ঋতুপরিবর্ত্তন ও ক্ষেত্রজ দূষিত বায়ুর কারণে সকলে বিশেষতঃ বালকেরা জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তাই কার্ত্তিক ও তাহার অনুচরবর্গ কুমারগ্রহ ও বালগ্রহ নামেও পরিচিত। কুমারগ্রহ কার্ত্তিক ও তাঁহার সহচরী ষষ্ঠীর অপ্রসন্নতার ভয়ে ভীত হইয়া হিন্দু শিশুরক্ষণের জন্য ইঁহাদের পূজা করিয়া আসিতেছেন।

বেড়াল ষষ্ঠীর বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছে কেন? ষষ্ঠীর ধ্যানে ষষ্ঠীকে 'মার্জার সংস্থিতা' বলিযা উক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠীং বিম্বাধরোষ্ঠিং সুরুচিরবসনাং কৃষ্ণমার্জারসংস্থাং।
কর্ণান্তক্রান্তনেত্রাং রুচিরভুজযুগাং ক্রোড়বিন্যস্তপুত্রাং।
তারুণ্যোদ্ভিন্নপীনস্তনঘটযুগলাং চিন্তয়েদিন্দ্বক্ত্রাং॥

(ষষ্ঠী ধ্যানং)

বেড়াল ষষ্ঠীর বাহন কেন না বেড়াল ইঁদুর ধ্বংসকারী। ইঁদুর ধান্যাদি শস্যের অনিষ্টকারী বলিয়াই ইঁদুর ধ্বংসের জন্য এই আয়োজন। এতদ্ভিন্ন বালকের জ্বর বিনাশ করিবার ক্ষমতাও বিড়ালের আছে।—

বিড়ালের বিষ্ঠার ধূপ শিশুর জ্বর ও কুমারগ্রহ বিনাশে অশেষ কার্য্যকর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—

"বিড়ালবিড়জালোম মেষশৃঙ্গবচামধু।
ধূপশিশোর্জ্বরঘ্নোঽয়মশেষগ্রহনাশনঃ॥"

"বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেষশৃঙ্গ, বচ ও মধু এই সকল দ্রব্যের ধূপ বালকগণের জ্বরনাশক ও অশেষ গ্রহনাশক।"

পুনশ্চ—

'পয়সা বৃশদংশস্য শকৃদ্বা তদহঃ পিবেৎ'

বিষমজ্বরে বিড়ালের বিষ্ঠা দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

(চরক জ্বর চিকিৎসা)

এক ইঁদুর ধ্বংসকারী, দ্বিতীয় শিশুর জ্বরনাশক এই উভয় গুণসম্পন্ন বলিয়া বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর এত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

যাইহোক ষষ্ঠীর বাহন বেড়াল হওয়াতে মা ষষ্ঠী শিশুদিগের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন, কারণ ষষ্ঠীর বাহন পুষি বেড়ালকে শিশুরা বড়ই ভালবাসে।

আমরা দেখাইলাম যে হিন্দুর দেবতার বাহনকল্পনা নিরর্থক নহে—উহার মধ্যে কোন না কোন গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু এস্থলে পাঠকের চিত্তে একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে এই যে কার্ত্তিক প্রভৃতি হিন্দুর দেবতারা কেবল কি বাহ্যপ্রকৃতির রূপক কল্পনা কিম্বা উঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন। একটু প্রজ্ঞাচক্ষুসহকারে দেখিলেই সকল কথার মীমাংসা হইতে পারে। হিন্দুর দেবগণের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এক মহামিলন সম্বন্ধ চলিয়াছে। ইহাতে দেবতার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অনেক সময়ে হারাইয়া ফেলিয়া বহিঃপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইতে হয়। স্কন্দ যে একজন অলৌকিক দেবপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্কন্দের সঙ্গে কার্ত্তিক মাসের এমন একটি অচ্ছেদ্য মিলন সংঘটিত হইয়াছে যে, উপর উপর দেখিলে স্কন্দের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবে গভীরতায় প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলে প্রাকৃতিক কার্ত্তিক মাস ও পুরুষপ্রবর কার্ত্তিককে বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়। আরেকটী

উদাহরণ দিই। অগস্ত্য ঋষি প্রকৃতই এক মহাশক্তি-সম্পন্ন ঋষি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও ভারতে অগস্ত্য গোত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতীয় কবিগণ কর্ত্তৃক অগস্ত্যে মাস বা ভাদ্র মাসের সঙ্গে অগস্ত্য ঋষির এমন ভাবে সমন্ধ জাল রচিত হইয়াছে যে, অগস্ত্য ঋষিকে উপর উপর দেখিলে রূপক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। ষষ্ঠী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। স্কন্দ-পত্নীর অন্যতম নাম ষষ্ঠী।

এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ।
ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুঃ লক্ষ্মীমাশাং সুখপ্রদাম্॥ *

স্কন্দের মহিষীকে ব্রাহ্মণেরা ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা ইত্যাদি নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার প্রকৃতির ষষ্ঠাংশকে দেবীরূপে কল্পনা করিয়া উহার সহিত স্কন্দপত্নীর এমন একটী রূপক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে যে সহজেই বিষম ধাঁদা লাগিয়া যায়।

আমরা এ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা বিশেষ-ভাবে করিব না। কারণ এ প্রবন্ধে বাহনগুলার প্রতিই

* মহাভারত।

আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু বাহনের প্রসঙ্গে দেব-দেবীও না আসিয়া যাইতে পারেন না। যাই হউক এই দুঃসময়ে সমাগতা লক্ষ্মী ও ষষ্ঠিদেবী বাহনারূঢ়া হইয়া গৃহে গৃহে বিরাজ করুন তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি দূরীভূত হইবে এবং সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বর্ষিত হইবে। †

† এই প্রবন্ধ ১৩০৭ সালে, আশ্বিন সংখ্যার "পুণ্যে" প্রকাশিত হয়।

খাবারের নামতত্ত্ব। *

জলপান।

কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে কি শিল্পে কি সাহিত্যে, সকল বিষয়েই আদান প্রদানের দ্বারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনই মানব জাতির সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাতেই মানব জাতির কুটুম্বিতা রক্ষিত হয়। যেমন এক পরিবার অন্যান্য পরিবারের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মানব জাতিও এক কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ। এই আত্মীয়তা থাকাতেই সহস্র যুদ্ধ বিরোধ সত্ত্বেও সভ্য জাতিরা পরস্পরের সহিত শিল্প ও বিদ্যা প্রভৃতির আদান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহে। কোনও সুস্বাদু খাদ্য-সামগ্রী হস্তগত হইলে আত্মীয়গণের সহিত বণ্টন না

* এই প্রবন্ধ ১৩০৩ সালে ভাদ্রের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়।

করিয়া খাইলে যেমন তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ কোন সভ্য জাতিই তাহার জ্ঞানলব্ধ ধন, তাহার শিল্প, তাহার উপভোগ্য বস্তুসমূহে অন্যান্য জাতিদিগকে অংশীদার না করিয়া একাকী উন্নত হইতে ইচ্ছা করে না। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, জাতিবিশেষের ভাষা হইতে শব্দসমূহ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য জাতির ভাষা পরিপুষ্ট, জাতিবিশেষের শিল্প ও সাহিত্যের দ্বারা অন্যান্য জাতিরা উন্নত, এবং জাতিবিশেষের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা অন্যান্য জাতি আলোকিত হয়।

আহার বিষয়েও দেখা যায়, মানব জাতির মধ্যে আদান প্রদানের ভাব বর্ত্তমান। খাদ্যাখাদ্য লইয়া যদিও অনেক সময়ে জাতিতে জাতিতে কলহ বিবাদ ঘটিতে দেখা যায়, তথাপি ইহাও দেখা যায় যে, খাদ্য সম্বন্ধে শত্রু মিত্র সকল জাতির মধ্যে একটা অন্তঃসলিল বিনিময়ের স্রোত বহমান। খাদ্যাখাদ্য লইয়া যদিও হিন্দু মুসলমানে বিরোধ আছে, তথাপি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই খাদ্য সম্বন্ধে পরস্পরের অনুকরণ করিতেও ছাড়ে নাই। আজকাল আমাদিগের ভাত প্রভৃতি

দেশীয় খাছাদি য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ প্রচলিত হইতেছে, সেইরূপ আবার কাট্‌লেট্‌ চপ প্রভৃতি য়ুরোপ-প্রচলিত খাদ্যগুলিও আমাদের মধ্যে "ঘরোয়া" হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কেবল বর্ত্তমান যুগে নয়, বহু প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির মধ্যে এইরূপ খাদ্যের বিনিময় চলিয়াছে। কিন্তু খাদ্য বিষয়ক এমন কোন ইতিহাস নাই যে, আমরা ঠিক জানিতে পারি, কোন্ খাদ্যটির জন্য কোন্ জাতি গৌরব করিতে পারে। এক একটি খাদ্যসামগ্রী কত প্রাচীন কালের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে; কত যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে হয় ত এক একটী খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য কত যত্ন কত পরিশ্রম গিয়াছে। আমরা যে সকল খাদ্যসামগ্রী নিত্য আহার করি, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলির নাম কোনও প্রাচীন ভাষারূপ গিরিশিখর হইতে প্রবাহিত হইয়া, যুগযুগান্তর পরে বঙ্গভাষার ন্যায় কোনও উপভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে। এমন অনেক খাদ্যদ্রব্যের নাম পাওয়া যায়, যাহা একটি প্রাচীন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া এক্ষণে শত শত

দেশের ভাষায় স্থান পাইয়াছে। অনেক খাবারের নামের ভিতরে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে দেখা যায়। কি ফল মূল, ডালনা কালিয়া প্রভৃতি রাঁধা সামগ্রী, কি মিষ্টান্ন কি রাঁধিবার পাত্রাদি উপকরণ, কিছুরই নাম একটা নিরর্থক শব্দ নহে; প্রত্যেকের নামের মূলে কোন না কোন অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা এই প্রচ্ছন্ন অর্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সর্ব্বাগ্রে জলপানের নামগুলি আলোচনার্থ গৃহীত হইল।

প্রথমে দেখা যা'ক, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাবারের নাম "জলপান" হইল কেন। জল এবং পান, এই দুটি শব্দকে পৃথক করিয়া অর্থ করিতে গেলে, জল পান করা অর্থাৎ জল খাওয়া বুঝায়; কিন্তু এক্ষণে ইহারা এক যোগে যুক্ত: হইয়া ভিন্ন অর্থ ব্যক্ত করিতেছে; জলপান এই যোগরূঢ় শব্দের সহিত পানীয়ের এক্ষণে বড় একটা সম্বন্ধ নাই; বিনা জলে এক ব্যক্তি মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারা বেশ জলপান করিতে পারে। পানীয় জল না খাইলে যে কাহারও জলপান করা অথবা জলপান খাওয়া হইল না তাহা নয়।

কিন্তু জলই যে জলপান শব্দের মূলে, ইহা নিশ্চিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পানীয় দ্রব্যই সর্ব্বপ্রকার সৎকার বিষয়ে মুখ্য বলিয়া সচরাচর গণ্য হয়; কিন্তু কোন ব্যক্তিকে কেবল পানীয়ের দ্বারা সৎকার করিলে সৎকারের কেমন একটু অভাব থাকিয়া যায়; তাই সমাজে পানীয় জল দিবার সঙ্গে একটু কিছু খাবার দিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে জলই প্রধান ছিল, খাবারটা পানীয়েরই আনুষঙ্গিক মাত্র ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ খাদ্যই পানীয়ের উপর জয়লাভ করিয়াছে—এক্ষণে খাবারের নামই 'জলপান' দাঁড়াইয়াছে।

ভাতই আমাদিগের বাঙ্গলা দেশে প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত; মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারা যে সামান্য আহার সম্পন্ন হয়, তাহাই 'জলপান' বা 'জলখাবার' নামে প্রসিদ্ধ। আজকাল "চা-পানে"র সময়ে 'চা'র সঙ্গে বিস্কুট প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্যও থাকে। কিছু কাল পরে হয় ত বা জলপানের ন্যায় বিস্কুট প্রভৃতি আহারের নামই চা-পান হইয়া দাঁড়াইবে; চা-পানে হয় ত বা 'চা' থাকিবে না।

'জলপান'ও যাহার নাম, বস্তুতঃ 'জলখাবার'ও তাহারই নাম ; উভয় শব্দই প্রায় একই অর্থবাচক। জল-পান শব্দের ন্যায় 'জলযোগ' শব্দও একই কারণে উৎপন্ন।

'জলপানের' খাবারের নামগুলি এক সময়ে এক জনের প্রদত্ত নহে ; কতকগুলি নাম অতি প্রাচীন কাল, এমন কি বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; কতকগুলি বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। আবার কোন একটীমাত্র বিশেষ কারণই যে, সকল খাবারের নামগুলির উৎপত্তিকারণ, তাহা নহে। কতকগুলি নাম উপকরণ এবং প্রস্তুতপ্রণালী হইতে উৎপন্ন ; কতকগুলি নাম আকার ও গঠন হইতে উৎপন্ন ; কতকগুলি নাম দেব দেবী ও খ্যাতনামা ব্যক্তির নামানুসারে হইয়াছে ; কতকগুলি নাম আস্বাদ বা গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। উদাহরণ দ্বারা আমার কথা ক্রমে সুস্পষ্ট করা যাইতেছে।

'পান্‌তয়া' নাম হইল কেন ? পানতয়া নাম শুনিলেই সহসা মনে হয়, বুঝি জলপানের মিষ্টান্ন বলিয়া 'পান' এবং জলার্থ 'তোয়' শব্দ হইতেই 'পানতোয়া' নাম আসিয়া

থাকিবে। কিন্তু তাহা নহে। পানতয়ার যে রস, তাহাকে হিন্দীতে “পানিচাসনি” বা “পানিরস” বলে। ‘পানি রস’ অর্থে যে রস ভাল করিয়া জ্বাল হয় নাই, যাহা অনেকটা জলীয় আছে। এই “পানিরসে” ‘পানতোয়া’র কোয়াগুলি ফেলা থাকে বলিয়াই ‘পানতোয়া’ নাম হইয়াছে। জলে ভাত ভিজান থাকিলে তাহাকে যেমন ‘পান্‌তা’ বা ‘পান্‌ত’ ভাত বলা যায়, পানিরস হইতে সেই কারণে পানতোয়া নামও হইয়াছে। পান্‌তা, পান্‌ত, পানতোয়া ইহারা প্রায় একই কথা। পশ্চিম-ভারতবাসীরা ‘ওয়া’ বা ‘উয়া’ অন্ত করিয়া কথা ব্যবহার করিতে বড় ভালবাসে ;—যেমন ময়ূরকে “মোরোয়া” বলিবে, ক্ষেতকে “ক্ষেতোয়া” বলিবে, বঁধুকে “বঁধুয়া” বলিবে ইত্যাদি ; ‘পান্‌তয়া’ও এই কারণে ‘ওয়া’ অন্ত শব্দ হইয়া থাকিবে। অথবা ‘পানতোয়া’ শব্দ ‘পানি-টোপ’ হইতেও আসিতে পারে—‘পানিরসে’ টোপ টোপ ফেলা হয় বলিয়া “পানি-টোপ” শব্দ ক্রমে ‘পানতোয়া’য় পরিণত হইয়া থাকিবে। যেমন ‘কূপ’ শব্দ ‘কুয়া’য় পরিণত, তেমনি ‘পানিটোপ’ এরও ‘টোপ’ শব্দ ‘টোয়া’য়

পরিণত হওয়া সম্ভব। 'পানিটোপ' হইতে 'পানিটোয়া' ও ক্রমে 'পানতোয়া'র উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যাই হৌক 'পানিচাসনি' বা 'পানিরস' যে ইহার মূলে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। ইহা যে হিন্দী হইতে বঙ্গভাষায় প্রবেশলাভ বরিয়াছে, 'পানিচাসনি'র পানি শব্দই তাহার প্রমাণ।

সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে "দুগ্ধকূপিকা" নামে যে একটি মিষ্টান্নের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা 'পানতোয়া' ভিন্ন আর কিছু নহে। পানতোয়ার এবং দুগ্ধকূপিকার প্রস্তুত-প্রণালীর মধ্যে খুব সামান্য ইতরবিশেষই লক্ষিত হয়। 'ভাবপ্রকাশে' দুগ্ধকূপিকা প্রস্তুত করিবার কালে ছানার সহিত তণ্ডুলচূর্ণ বা সফেদা মিশ্রিত করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু ছানার সহিত সফেদা দিলে মুচমুচে শক্ত হয় বলিয়াই আজকাল সফেদার পরিবর্ত্তে 'পানতয়া'তে ময়দাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধকূপিকাগুলিকে ভাবপ্রকাশ ক্ষীরের পূর দিয়া "পূর্ণগর্ভা" করিতে বলিয়াছেন; এক্ষণে কিন্তু পানতোয়ার ভিতরে ক্ষীরের পূরের পরিবর্ত্তে দুই একটি এলাচদানা দিয়াই অনেক

সময়ে কাজ সারিয়া ফেলা হয়। দুগ্ধসঞ্জাত ছানা ও ক্ষীরের পূরই 'দুগ্ধকূপিকা' নামের কারণ; 'কূপিকা' অর্থে কোয়া; এমন কি, 'কোয়া' শব্দই 'কূপিকা' শব্দের অপভ্রংশ। *

'জিলিপি' বা 'জিলিবি' নামের উৎপত্তিও রসের পাক হইতে। যেমন 'পানতোয়া' নামের কারণ 'পানি-চাসনি' পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, সেইরূপ রসের গাঢ়-তা ভ্য তারতম্যেই 'জিলিবি' নামেরও উৎপত্তি হইয়াছে। 'জিলিবি' "জ্বালাও" শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'পানিচাসনি' অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে 'জ্বাল' পাইলে, তবে তাহাকে "জ্বালাও চাস্‌নি" বা "জ্বালাও রস" বলে। জিলিবির রস পানতোয়ার রস অপেক্ষা "কড়া" বলিয়াই আঙ্গুলে লাগাইলে সূতার ন্যায় উঠিতে থাকে; পানতোয়ার পানিরসে কিন্তু তাহা হয় না। 'জ্বালাও' শব্দ হইতে হিন্দীতে 'জ্বালাবি' এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালায় 'জিলিবি' ও 'জিলিপি' দাঁড়াইয়াছে। 'জ্বালাও' শব্দের মূলানুসন্ধানের

* ইংরাজীতে চায়ের পেয়ালাকে যে Cup বলে তাহাও যে সংস্কৃত 'কূপ' শব্দ সঞ্জাত তাহাতে সন্দেহ নাই।

জন্য আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না ; ইহা সহজেই ধরা যায় যে সংস্কৃত জ্বল ধাতুই "জ্বাল্", "জ্বালাও" প্রভৃতি শব্দের মূল। অনেকে 'জিলিবি'র সংস্কৃত 'জলবল্লী' করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু উহার প্রকৃত মূল 'জলবল্লী' নহে।

সংস্কৃত ভাষায় জিলিবিকে 'কুণ্ডলিনী' বলে।

"এষা কুণ্ডলিনী নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।" 'কুণ্ডলিনী' নাম আকৃতিবাচক। কুণ্ডলিনী বলে এই জন্য যে, ইহা কুণ্ডলাকৃতি করিয়া প্রস্তুত করা হয়। আমাদের বঙ্গ-ভাষাতেও "জিলিপির পাক" বা "জিলিবির প্যাঁচ" বলিয়া কথা প্রসিদ্ধ আছে।

"হালোয়া" বা "হালুয়া" এখনও বাঙ্গালীর খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান পায় নাই। বাঙ্গালীর হালোয়ার মধ্যে একমাত্র মোহনভোগই প্রচলিত। পশ্চিমে কিন্তু এই "হালোয়া" নামে নানাবিধ উত্তম খাদ্যসামগ্রী সকল প্রস্তুত হয়। হালোয়ামাত্রই খুব পুষ্টিকর, ও গুরুপাক ; পশ্চিমবাসীদিগেরই উপযুক্ত খাদ্য। পশ্চিমে যে 'হালোয়া' একটি প্রধান মিষ্টান্ন
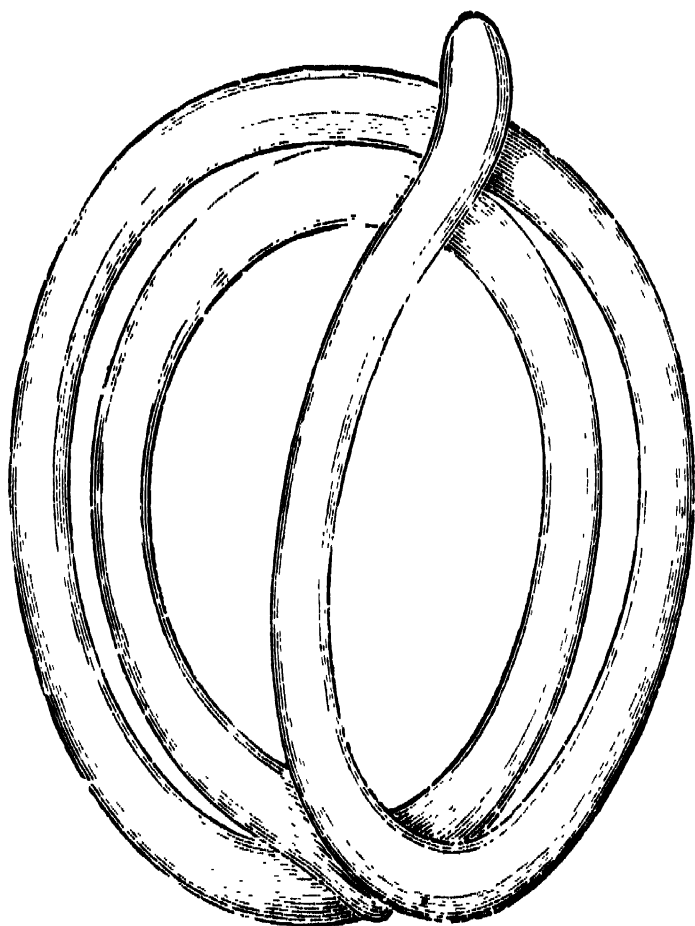
জিলাবি

বলিয়া গণ্য হয়, তাহার প্রমাণ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারীদিগকে পশ্চিমে "হালোয়াই" বলে। শুনা যায়, গুরুনানক এবং তন্মতাবলম্বী শিখেরা হালোয়ার অনেক উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। শিখেরা হালোয়াকে অতি পবিত্রজ্ঞানে দেবপ্রসাদ বলিয়া খাইয়া থাকে। এই জন্যই উহারা হালোয়াকে 'কঢ়াপ্রসাদ' নামে অভিহিত করে। কঢ়াপ্রসাদ এর অর্থ, যে সামগ্রী দেব-উদ্দেশে কটাহে পাক হয় এবং অবশেষে প্রসাদ রূপে বিতরিত হয়। "হালোয়া" নিরামিষাশী সত্ত্ব গুণাবলম্বী ব্রাহ্মণোপযোগী খাদ্য—তাই হিন্দি ভাষায় এক প্রবাদ আছে—

"হালুয়া মণ্ডা খায়।
ক্ষত্রী বিগড় যায়॥"

সচরাচর রজোগুণাবলম্বী ক্ষত্রিয়েরা মাংসাশী হইয়া থাকে ; তাই বলা হইয়াছে হালুয়া ক্ষত্রিয়োপযোগী খাদ্য নয়, ক্ষত্রিয়েরা ইহা খাইলে বিগড়িয়া যায়।

'হালোয়া' নাম হইয়াছে 'হালোয়া' প্রস্তুত করিবার প্রণালী হইতে। হালোয়া প্রস্তুত করিবার কালে হাতা হেলাইয়া হেলাইয়া অবিরত নাড়াই হইতেছে প্রধান কার্য্য ; ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অবিরাম নাড়িতে হয় ; এই হাতার দ্বারা নাড়াকে হিন্দীতে "হিলানা" বা "হেলানা"

বলে। হিলানা বা হেলানা শব্দ হইতেই "হিলোয়া" "হেলোয়া" এবং ক্রমশঃ 'হালোয়া' দাঁড়াইয়াছে। 'হিলানা' এবং 'হালোয়া' প্রভৃতি শব্দের মূলে সংস্কৃত 'হিল' ধাতু বিরাজ করিতেছে। 'হিল্লোল' 'হেলন' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি তুলনা কর।

'বরফির' উৎপত্তি হইয়াছে 'বরফ' শব্দ হইতে; 'বরফ' শব্দ পারস্য ভাষা হইতে হিন্দি ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'বরফি' প্রস্তুত করিবার কালে রস জমিয়া শক্ত বরফের ন্যায় হইয়া যায় বলিয়া 'বরফি' বলে।

এক্ষণে দেখা যাউক, 'বরফ' শব্দের মূল কি হইতে পারে। সংস্কৃত 'বৃষ' ধাতু হইতে 'বরফ' শব্দ আসা সম্ভব; তুষার বর্ষিত হয় বলিয়াই তুষারকে বরফ বলা সম্ভব; 'বরফ' শব্দের 'ষ' খুব সম্ভব 'ফ'তে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থলে দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দের শ, ষ ও স, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় ফতে পরিণত হয়; যথা সংস্কৃত 'গ্রাস' শব্দ ইংরাজীতে গ্রাস্প (Grasp), পারস্য ভাষায় গ্রেফ্‌ত এবং জর্ম্মণ ভাষায় গ্রিফ্ (Griff) হইয়াছে।

কিন্তু 'বরফ' শব্দের মূল 'বৃষ' ধাতুর সহিত যুক্ত

থাকিলেও ক্রমে উহা অনেকটা সংহতিবাচক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈত্য প্রযুক্ত সংহত হওয়া অর্থাৎ জমাট বাঁধাই তুষারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তুষারের এই সঙ্ঘাত ধর্ম্মই বরফ শব্দের সংহতিবাচক হওয়ার কারণ। এক্ষণে দেখা যায়, জমাট-বাঁধা সংহত দ্রব্য মাত্রেরই যেন 'বরফ' নামে অনেকটা অধিকার দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য লোকে কুল্পির বরফ, নালাই বরফ ইত্যাদি বলিয়া থাকে, এবং এই কারণেই এক শ্রেণীর মিষ্টান্নবিশেষের নামও 'বরফি' হইয়াছে।

'বরফ' শব্দ পারসি শব্দ হইলেও, দূর য়ুরোপীয় ভাষা-সমূহে উহার অনুরূপ শব্দ দুর্ল্লভ নহে। ইংরাজী ব্রীফ (Brief), ফরাসী ব্রেফ (Bref), লাটিন ব্রেভিস (Brevis) ইত্যাদি শব্দগুলি বরফ শব্দের সহিত সম্পূর্ণ একজাতীয় বলিয়া মনে হয়। ব্রীফ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শব্দগুলির অর্থ, সংহত বা সংক্ষিপ্ত ; এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, 'বরফ' শব্দও সংহতিবাচক। শব্দ এবং অর্থ দুই হিসাবেই 'বরফ' এবং 'ব্রিফ' প্রভৃতি

শব্দগুলিতে এতটা সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান যে, উহাদিগকে মূলে একজাতীয় বলিয়া স্পষ্টই চিনিতে পারা যায়।

অধিকাংশ জলপানের খাবারের নামের অনুরূপ 'বোঁদে' নামটীও আসলে হিন্দী নাম। প্রকৃত হিন্দী শব্দ 'বুন্দি'; 'বুন্দি' আসিয়াছে সংস্কৃত 'বিন্দু' শব্দ হইতে। খাদ্যসামগ্রীর আকার বারিবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু বলিয়া ইহাকে 'বুন্দি' বলে 'বুন্দির' অর্থ ই বারিবিন্দু।

'মতিচূর' বলে এই জন্য যে ইহার বোঁদেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় দেখিতে; 'মোতি' হিন্দী শব্দের অর্থ মুক্তা এবং চূর অর্থে চূর্ণ, অর্থাৎ গুঁড়া বা গুঁড়ার ন্যায় কোন কিছু। মতিচূর লাড়ুকে বাঙ্গলায় 'মেঠাই' বলা যায়। 'মেঠাই' শব্দ 'মিষ্ট' শব্দপ্রসূত।

মালপোয়া 'পূপ' বিশেষ। সংস্কৃত 'পূপ' শব্দ বাঙ্গলায় 'পূয়া' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

> মধুমস্তকসংযাবাঃ পূপা হ্যেতে বিশেষতঃ।
> গুরবো বৃংহণাশ্চৈব মোদকাস্তু সুদুর্জ্জরাঃ॥
> (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়)

'মধুমস্তক, সংযাব পূপ ও মোদক এই সকল খাদ্য গুরুপাক ও বৃংহণ।'

পেঁড়া 'পিণ্ড' শব্দের অপভ্রংশ। চরকে পিণ্ডাকৃতি মিষ্টান্নের নাম 'পিণ্ডিকা'র উল্লেখ দেখা যায়। *

'চন্দ্রপুলি' বলে, ইহা দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বলিয়া। সংস্কৃত 'পূপুলিকা' 'পূলিকা' মিষ্টান্ন বিশেষের নাম। 'পূলি' 'পূলিকা'রই সংক্ষেপ। †

'পেরাকি' বা 'পেড়াকি' নাম হইয়াছে, 'পেটক' শব্দের অপভ্রংশ হইয়া। সংস্কৃত পেটক শব্দের অর্থ পেঁটরা; পেঁটরার মধ্যে যেরূপ নানাবিধ দ্রব্যাদি পুরিয়া রাখা যায়, পেরাকির মধ্যেও সেইরূপ নারিকেলের ঝাঁই প্রভৃতি নানাবিধ পুর পূরিয়া দেওয়া হয় বলিয়াই, ইহাকে 'পেরাকি' অর্থাৎ 'পেটক' বলে। পেরাকির গড়নও অনেকটা পেঁটরার মত।

'খাজা' নামের মূল সংস্কৃত 'খর্জ্জ' শব্দ। দেখিতে খাঁজ খাঁজ এবড়ো খেবড়ো বলিয়া 'খাজা' নাম।

উপরোক্ত খাদ্যসামগ্রীগুলি হয় প্রস্তুত প্রণালী বা উপকরণ হইতে অথবা আকৃতি বা গঠন হইতে নাম

---

* চরক সূত্রস্থান ২৭ অধ্যায়।

† পূপাঃ পূপলিকাদ্যশ্চ গুরবঃ পৈষ্টিকাঃ পরং। (চরক)

প্রাপ্ত হইয়াছে। বাংলার অন্যতম প্রধান মিষ্টান্ন ‘রস-গোল্লা’র নাম আকৃতিবাচক—গোলাকৃতি বলিয়া গোল্লা নাম। এতদ্ভিন্ন ‘সীতাভোগ’ ‘রাঘবসাহি’ প্রভৃতি বাংলা মিষ্টান্নের নামগুলি দেবদেবীর নামে প্রসিদ্ধ।

যে মিষ্টান্নটী কোন ইংরাজ শাসকের নাম বাঙ্গলার লোকের মুখে মুখে চির-প্রচলিত করিয়াছে—তাহা “লেডিক্যানি”, “লেডিক্যানি” যে কিরূপ মিষ্টান্ন কোন বাঙ্গালীকে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। ভারতের বড়লাটপত্নী Lady Canning এর সুমধুর স্মৃতি বাঙ্গালীর প্রাণে চিরজাগরুক রাখিবার জন্য এই মিষ্টান্ন তাঁহার নামে উৎসর্গ করা হইয়া থাকিবে। ইহা বাঙ্গলার গৌরবের কথা যে জনৈক বাঙ্গালী মোদককার (ময়রা) ইহার উদ্ভাবয়িতা।

বাঙ্গলার মিষ্টান্নের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি লবণাক্ত সামগ্রীও ‘জলপানের’ ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যেমন ‘নিমকি’ ‘কচুরী’ ‘শিঙ্গাড়া’ ইত্যাদি। “নিমকি” নামের উৎপত্তি সহজেই ধরা পড়ে; হিন্দী লবণার্থ বাচক ‘নিমক’ শব্দ হইতে ‘নিম্‌কি’ নামের উৎপত্তি।

"কচুরী" প্রকৃত 'পুরী' শ্রেণীর অন্তর্ভূত; 'কচুরী' খাইবার কালে মুখের মধ্যে 'কচর্' 'কচর' শব্দ হয়—তাহার অনুকরণে 'কচুরী' নাম।

শিঙ্গাড়া শব্দ সংস্কৃত 'শৃঙ্গাটক' শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত শৃঙ্গাটক শব্দের অর্থ পানিফল। পানিফলের তিনদিকে শৃঙ্গের ন্যায় কাঁটা আছে বলিয়াই শৃঙ্গাটক নাম। হিন্দীতে পানিফলকে 'শিঙ্গাড়া' বলে; শিঙ্গাড়া এই পানিফলের আকারে করা হয় বলিয়াই, ইহারও নাম পানিফলের নামে রাখা হইয়াছে। সংস্কৃতেও এই জলপানের সামগ্রীকে 'শৃঙ্গাটক' বলে।

"মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্‌গুরু।"

অর্থাৎ "মাংসের শিঙ্গাড়া রুচিকর, পোষ্টাই, বলকারী ও গুরুপাক"।

সন্দেশ। *

—০ঃ*ঃ০—

বঙ্গদেশে 'জলপানে'র মিষ্টান্নের কোন অভাব নাই ; কিন্তু তন্মধ্যে উপরোক্ত 'জিলিবি' প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রী বাঙ্গলার নিজস্ব বলিয়া বলা যায় না। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণে বঙ্গমাতা বড় অল্প কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই। এক-দিকে যেমন পশ্চিমভারত অন্যদিকে তেমনি বঙ্গদেশ ভারতের এই দুই বিভাগই ভাবতীয় মিষ্টান্নের বিচিত্রতা ও উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানীরা আহারে বলবীর্য্য 'তাগদ' যাহাতে হয়, সেজন্য কত যত্ন করে ; কিন্তু বাঙ্গালীরা

* ১৩০৪ সাল 'ভাদ্র ও আশ্বিন নাসের' পুণ্য মাসিক পত্রে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

রসোপভোগ চায়, অতটা বলবীর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। বাঙ্গলার মত এত রসালো মিষ্টান্ন আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। ঘৃত, দুগ্ধ, হালুয়া ও ক্ষীর-জাত মিষ্টান্ন প্রভৃতি বীর্য্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য হিন্দু-স্থানীরা সচরাচর খাইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালীরা ঘৃত দুগ্ধ ক্ষীর অপেক্ষা বিকৃত দুগ্ধ ছানা ভালবাসে এবং ছানাকে রসমণ্ডিত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু মিষ্টান্নে পরিণত করে ; সেই কারণে ছানা প্রস্তুত 'সন্দেশ'ই বাঙ্গালীর মিষ্টান্নে সর্ব্বপ্রধান আসন পাইয়াছে।

ব্যঞ্জনাদি রন্ধনকালেও হিন্দুস্থানীদিগকে হিং জীরা প্রভৃতি হজমী ও উপকারী মসলা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বাঙ্গালীরা ভোজনকালে ক্ষীর মৎস্য প্রভৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অপকারী বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পশ্চিমবাসীরা এ সকলের বিশেষ বিরোধী। আপাততঃ ক্ষীর, মৎস্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র আহারে হয়ত বা কিছু নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহার কুফল অনেক সময়ে কলেরা, টাইফয়েড্, দুরারোগ্য অম্ল প্রভৃতি রোগে পর্য্যবসিত

হয়। * আহার বিষয়ে অসতর্কতাই যে বাঙ্গালীর অনেক রোগের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বদেশবাসীর রোগের কথা পশ্চিমে একটা প্রবচনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। 'পূরবী রোগী' প্রবাদটী পশ্চিমী সাধু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে বদ্ধমূল।

পশ্চিম-ভারতের মিষ্টান্ন যেমন ক্ষীর-প্রধান, বঙ্গদেশের মিষ্টান্ন তেমনি ছানা-প্রধান। যে ছানা হিন্দুস্থানবাসীরা মুর্দ্দা অর্থাৎ মৃত পদার্থ বলিয়া গণ্য করে ; দশ সের ও বিশ সের দুগ্ধও যদি ছানা হইয়া যায় তবু ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই ছানা বাঙ্গালীর খাবারের প্রতিপদে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুস্থানীদের মতে, যেমন মৃত জীব পরিত্যজ্য সেইরূপ মৃত দুগ্ধ ছানাও বিশেষ অপকারী বলিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু

* এইরূপ বিরুদ্ধ ভোজন করিলে রক্ত দূষিত হয় "বিরুদ্ধ বীর্য্যত্বাচ্ছোনিত প্রদূষণায়"। মৎস্য মাংস প্রভৃতি দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন যে নানা রোগের আকর তাহা আয়ুর্ব্বেদে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও এইরূপ দুগ্ধ ও মাংস প্রভৃতির একত্র ভোজনের অপকারিতা স্বীকার করেন।

এই ছানা বাঙ্গালীর কালিয়ায়, পোলাওয়ে, অম্বলে এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি অধিকাংশ আহার্য্য দ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এমন কি যে মিষ্টান্নটীর নাম 'ক্ষীর-মোহন' তাহা ছানারই প্রস্তুত, ক্ষীরের সহিত সম্পর্ক অত্যল্পই। পশ্চিমে ছানার আদর নাই, তাহার কারণ খুব সম্ভবতঃ দুগ্ধের প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা এবং ছানার ধারক গুণ ; আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণ লিখিত আছে,—

'বাতঘ্নী গ্রাহিণী রুক্ষা দুর্জ্জরা দধিকুর্চ্চিকা।'

ছানা বাত নাশক, সহজে জীর্ণ হয় না, রুক্ষ এবং ধারক। গ্রাহী অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধকারক বলিয়াই পশ্চিমের টান দেশে ছানা এত ঘৃণিত হইয়া থাকিবে। ছানার যে কোন উপকারিতা নাই তাহা নহে। বঙ্গের জল হওয়া ততটা টান বা কষা নহে যে ছানার গ্রাহিণী শক্তি বিশেষ অপকার করিবে। যে কোন কারণেই হউক না কেন বাঙ্গালা মিষ্টান্নে ছানা প্রধান উপকরণ হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে ছানা ও ছানাসর্ব্বস্ব সন্দেশের বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

'ছানা' নামটী কোথা হইতে আমরা পাইলাম দেখা

যাউক। 'ছানা' নামটীর মূল কোথায়? 'ছানা' শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত 'ছিন্ন' শব্দই 'ছানা' শব্দের মূল। যেমন 'চিহ্ন' শব্দ হইতে 'চেনা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে দেখা যায়, সেইরূপ 'ছিন্ন' হইতে 'ছেনা' বা 'ছানা' দাঁড়াইয়াছে। দুধ ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া 'ছানা' নাম। কিন্তু সংস্কৃতে 'ছানা' অর্থবাচক 'ছিন্ন' বলিয়া কোন শব্দ নাই। সংস্কৃত 'ছিন্ন' শব্দের অর্থ ছেঁড়া' এবং দুধ ছিঁড়িয়া গিয়া ছানা হয় বলিয়াই আমরা সংস্কৃত 'ছিন্ন' শব্দকে এই অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিযাছি।

বাঙ্গালায় 'ছানা' শব্দে যে 'শাবক' বুঝায় তাহারও মূলে ঐ সংস্কৃত 'ছিন্ন' শব্দ। নাড়ী ছিন্ন করিয়াই শাবকেরা বাহির হয় বলিয়া এস্থলেও 'ছেনা বা 'ছানা' বলে।

সংস্কৃতে ক্ষীরবিকার বা ছানার অন্যতম নাম 'কূর্চা' বা 'কূর্চী'। এই 'কূর্চা' বা কূর্চী শব্দই ইংরাজী Cheese শব্দের মূল। Cheese ও যাহা, কূর্চী বা ছানাও তাহাই। তবে Cheese প্রস্তুত কালে দুধকে ছিঁড়ি-

বার জন্য অনেক স্থলে দধি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'রেনেট' (জান্তব অম্লবিশেষ) ব্যবহৃত হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিত-গণের মতে ইংরাজী Cheese শব্দ স্যাক্সন Cyse (কইসে) ও জর্ম্মন kase (কাসে) শব্দ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই 'কাসে' বা 'কইসে' যে সংস্কৃত 'কূর্চী' শব্দের অপভ্রংশ তাহা শ্রবণমাত্রই বুঝা যায়।

ছানার আরেকটী সংস্কৃত নাম "কিলাট"।

নষ্ট দুগ্ধস্য পকস্য পিণ্ডপ্রোক্তঃ কিলাটকঃ।

"পক্ক নষ্ট দুগ্ধের পিণ্ডকে কিলাট বলে।" ছানা পিণ্ডাকৃতি হয় বলিয়াই উহার অন্যতম নাম 'কিলাট'।

পক্বং দধ্না সমং ক্ষীরং বিজ্ঞেয়া দধিকূর্চিকা।
তক্রেণ তক্রকূর্চা স্যাত্তয়োঃ পিণ্ড কিলাটকঃ॥

"দধির সহিত দুগ্ধ পক্ক হইলে যে ক্ষীরবিকার প্রস্তুত হয় তাহার নাম 'দধিকূর্চিকা' এবং তক্রের সহিত পক্ক দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত পদার্থের নাম 'তক্রকূর্চা'। তাহা-দের উভয়ের পিণ্ডকেই 'কিলাট' বলে।" শোধিত ক্ষীরপিণ্ডকেও 'কিলাট' বলে। অতএব দেখা যাইতেছে পিণ্ডীভূত দ্রব্যের সাধারণ নাম 'কিলাট'। ইংরাজীতেও

ইহার অনুরূপ শব্দ আমরা দেখিতে পাই। ইংরাজী 'ক্লট' (clot) শব্দে ঘনীভূত বা পিণ্ডীভূত হওয়া বুঝায়। দুগ্ধ পাক করিয়া পিণ্ডভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'ক্লটেড ক্রীম' (clotted cream) ইংরাজীতে বলে। পাক বিষয়ে সুপণ্ডিত কোন সাহেবও 'ছানার' ইংরাজী নাম ডিভনশায়র ক্লটেড ক্রীম (devonshire clotted cream) বলিয়াছেন। এই 'ক্লট' শব্দ ও 'কিলাট' শব্দ-দ্বয় যে একই শব্দ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃত কিলাট শব্দ হইতে ইংরাজী 'ক্লট' (clot) শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু কিলাট শব্দেরও মূলে আমরা আরেকটী শব্দ দেখিতে পাই, যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এই শব্দটী বেদমন্ত্রের 'কীলাল' শব্দ।

ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ
কীলালং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্।

"অমৃত, ঘৃত, দুগ্ধ ও কীলাল (অন্নের মণ্ড) ইহারা অন্নরূপে পিতৃগণকে তৃপ্ত করুক" এই যজুর্ব্বেদোক্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্রটীর বিনিয়োগ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে পিণ্ডসেচনে—

অর্থাৎ এই মন্ত্রে পিতৃদিগের পিণ্ডসিঞ্চন হয়। পিতৃ-পিণ্ডের জন্য অন্নমণ্ডকেই ‘কীলাল’ বলে। এই বৈদিক ‘কীলাল’ শব্দের পরিণতিই ‘কিলাট’ বা ‘কীলাট’। ‘ডলয়োরভেদঃ’ এই নিয়মানুসারে ‘কীলাল’ হইতে ‘কীলাড’ হইয়াছে এবং কীলাড শব্দের ‘কীলাট’ বা ‘কিলাট’য়ে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক।

সন্দেশের উপকরণে এক ছানাই সর্ব্বস্ব। প্রায় দেখা যায় উপকরণের অথবা আহার প্রস্তুতপ্রণালীর অনুযায়ী নামে খাদ্য সামগ্রীর নাম হইয়া থাকে; কিন্তু সন্দেশের নাম সে কারণে হয় নাই।

বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান মিষ্টান্ন ‘সন্দেশ’। এত দেশ থাকিতে এই মিষ্টান্নের ‘সন্দেশ’ নাম হইতে গেল কেন? ‘সন্দেশে’র প্রকৃত অর্থ খবর বা বার্ত্তা; বঙ্গে প্রধানতঃ এই মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়াই জ্ঞাতি কুটুম্বের খবর বা সন্দেশ লওয়া হইত বলিয়া ইহার ‘সন্দেশ’ নাম হইয়াছে। জ্ঞাতি কুটুম্বের নিকট খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে তাহাকে ‘তত্ত্ব পাঠান’ বলে। জ্ঞাতি কুটুম্বের খবরাখবর লইতে গেলেই রিক্তহস্তে না করিয়া কিছু আহার সামগ্রী

প্রেরণ করাই এদেশের আচার সম্মত ; তাই কুটুম্বের নিকট আহারাদি প্রেরণের নামই ক্রমে 'তত্ত্ব পাঠান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গে হিন্দুদিগের মধ্যে 'তত্ত্ব' পাঠাইবার কালে সন্দেশ প্রেরণ করাই প্রচলিত প্রথা। তত্ত্ব বা তত্ত্বানুন্ধান অথবা সন্দেশ অর্থাৎ খবর লইবার কালে যে মিষ্টান্ন প্রেরণ করা হয়, তাহারই নাম 'সন্দেশ।'

তত্ত্ব পাঠাইবার কালে প্রধানতঃ সন্দেশ প্রেরণের ব্যবস্থা হইল কেন ? তাহার একটী কারণ বাঙ্গালীরা ছানা-প্রিয় এবং অপর কারণ ইতর জাতির স্পর্শেও সন্দেশে কোন দোষ নাই বলিয়া। মেঠাই প্রভৃতি অনেক মিষ্টান্নেই বেশন, চালের গুঁড়ি প্রভৃতি থাকায় উহা অন্নের সামিল বলিয়া ধরে। এই কারণে প্রকৃত অন্ন যেমন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির স্পর্শে হিন্দুদিগের অভোজ্য বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ বেশন, চালের গুঁড়ি প্রভৃতি যে সকল মিষ্টান্নে থাকে, তাহারাও সকলের হাতে খাইবার যোগ্য নহে বলিয়াই বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের বিশ্বাস। তাই সন্দেশের ন্যায় মিষ্টান্ন,

যাহাতে চালের গুঁড়ি প্রভৃতির কোন সম্পর্ক নাই, যাহা সকলের হাতেই খাওয়া যায়, এইরূপ মিষ্টান্নের প্রেরণ সকলের পক্ষে বড় সুবিধাকর। অবশ্য এ প্রথা কেবল বঙ্গেই প্রচলিত, অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

'সন্দেশ' এক প্রকার নয়, নানা প্রকারের হইয়া থাকে; কিন্তু জিনিষ প্রায়ই একই, অধিকাংশ সময়ে পার্থক্য কেবল আকৃতিতে অথবা দু একটু উপকরণের তারতম্যে। যেমন তালশাঁসের ন্যায় যে সন্দেশের গড়ন তাহার নাম 'তালশাঁস-সন্দেশ', আমের ন্যায় গড়ন যাহার তাহার নাম 'আম-সন্দেশ', যে সন্দেশ চিনির পরিবর্ত্তে নূতন গুড়ের তৈয়ারী তাহার নাম 'নূতন গুড়ের সন্দেশ' ইত্যাদি। 'লেচি সন্দেশ' নামেরও কারণ লেচি বা নেচির অনুরূপ গড়ন। রুটী প্রভৃতি প্রস্তুত কালে থেশা ময়দা হইতে যে খণ্ড খণ্ড কাটা হয়, তাহাকেই 'নেচি' বা 'লেচি' বলে। 'লেচি' শব্দ সংস্কৃত 'লোপ্‌ত্রী' শব্দের অপভ্রংশ। 'লোপ্‌ত্রী' হইতে হিন্দুস্থানী ভাষায় 'লোথ্‌রা' ও 'লোই' এবং বাঙ্গালায় 'লেটি'

ও 'লেচি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত পাকশাস্ত্রে "লোপ্‌ত্রী" অর্থাৎ 'লেচী' বেল্লন দ্বারা বেলিবার কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, যথা—

'পুনস্তাং বেল্লয়েল্লোপ্‌ত্রীং যথা স্যাৎ মণ্ডলাকৃতি'।

লুচিতরকারি। *

লুচিতরকারীর নামে আপনারা অনেক হয়ত আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন যে আজ সাহিত্যপরিষদে বুঝিবা একটা ভোজ আছে—চর্ব্ব্যচোষ্যের বন্দোবস্ত আছে। এই ভরাভাদ্রের বৈকালে গরম গরম লুচিতরকারি যে

* ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসে সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনে ইহা প্রপঠিত।

ইতিপূর্ব্বে 'খাবারের নামতত্ত্ব' প্রবন্ধে বাঙ্গলার জলপান (অর্থাৎ পানতোয়া জিলাবি প্রভৃতি খাবারের বাঙ্গলা নামগুলির উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে লুচিতরকারী সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথাই বলা হয় নাই।

কি উপাদেয় পূর্ব্ব হইতেই হয়ত আপনারা লেলিহমান কল্পনা-রসনায় তাহার আস্বাদ লইতেছেন। কিন্তু ভাদ্রের শেষে অরন্ধন—অগ্নিপক্ক টাটকা জিনিষ খাইতে নাই, তাই আজ অতীত কথারূপ বাসী সামগ্রী লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত। লুচিতরকারির পুরাতত্ত্ব-রূপ আহার্য্য লইয়া আজ আমি পরিষদের অধিবেশনে আপনাদিগকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত। আহারে আপনারা তৃপ্ত হইলে অর্থাৎ যদি ইহা হইতে কোন আলোচনার বিষয় তৃপ্তিসহকারে আহরণ করেন তবেই আমি কৃতার্থ হইব।

আমাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইবার আহার করা রীতি আছে। মুনিঋষিরা দুবার খাবারেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"মুনিভির্দ্বিরশনম্প্রোক্তং।" (কাত্যায়ন)

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"সায়ংপ্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং দেবনির্ম্মিতম্।"

"দ্বিজাতিগণের সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুইবার খাওয়াই প্রশস্ত।" আমাদের সকালের দিকে যেমন

প্রধান খাবার ডালভাত তেমনি বৈকালের প্রধান খাবার লুচিতরকারী।

লুচিটা প্রকৃতপক্ষে অপূপ বা পিষ্টকজাতীয়। যাহা পেষিত দ্রব্য হইতে প্রস্তুত তাহাই 'পিষ্টক' শব্দ বাচ্য। গোধূম বা তণ্ডুলাদি চূর্ণ প্রভৃতি পেষিত দ্রব্য-প্রস্তুত খাদ্যমাত্রেই পিষ্টক-শ্রেণীর অন্তর্গত। 'অপূপ' ও 'পিষ্টক' উহারা একার্থবাচক।

পূপোঽপূপঃ পিষ্টকঃ স্যাৎ। (অমরকোষ)

"পিষ্টক" শব্দ 'পিষ্ট' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'পিষ্ট' শব্দের এক অর্থ নিরুক্তকার লিখিয়াছেন—"অবয়বশো বিভক্তং" "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বে যাহা বিভক্ত অর্থাৎ চূর্ণিত।" লুচি, রুটী (রোটিকা), বড়া (বটক), লাড়ু, (লড্ডুক), কচুরী, পুরী, পরোটা ইহারা পেষিত বা চূর্ণিত গোধূমাদি হইতে প্রস্তুত বলিয়া সকলেই পিষ্টক-জাতীয়; কিন্তু ভক্ত বা ভাত পিষ্টক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, কারণ উহা পেষিত দ্রব্য প্রস্তুত নহে।

এই পিষ্টকজাতীয় খাদ্যসামগ্রী বড় আজকালের উদ্ভাবিত নহে। যুগযুগান্তর পূর্ব্বে আদিম কাল হইতে

এই অপূপ শ্রেণীর খাদ্য ভারতে প্রচলিত। বৈদিক যুগে যে সময়ে যজ্ঞের আবির্ভাব, সেই সময়ে এই পিষ্টক জাতীয় খাদ্য ভারতে প্রসার লাভ করে। ঋগ্বেদে এই পিষ্টকজাতীয় নানাবিধ খাদ্যের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্য দান করিবার কালে বলিতেছেন—

ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তং *
উক্থিনং ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ। †

"হে ইন্দ্র! ভৃষ্টযবযুক্ত, দধিমিশ্রিতসক্তুযুক্ত, পিষ্টক-যুক্ত ও উক্থ্‌বিশিষ্ট হব্য আমাদের প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর।"

---

* দধিমিশ্রিত সক্তুকে বৈদিকযুগে 'করম্ভ' বলিত। এক্ষণে আমাদের দেশে করম্ভের বড় একটা প্রচলন নাই। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে 'করম্ভ' প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। তবে সে দেশে দধি দুর্লভ বলিয়া তদভাবে নারিকেল দুগ্ধ এবং সক্তুর অভাবে তণ্ডুলচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ইংরাজীতে রুটীর গুঁড়ো বা কোন চূর্ণ খাদ্যদ্রব্যকে যে, Crumb বলে, তাহার মূল সম্ভবত এই বৈদিক 'করম্ভ' বা 'করম্ব' শব্দ।

† ঋগ্বেদ ৩য় অষ্টক, ৩য় অধ্যায় ৫২ সূক্ত।

এই 'অপূপ'এর আকার যে কিরূপ তাহাও বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

'এক কপালান্।' ‡

'অপূপান্ ত্রৈয়ম্বকপ্রমাণাণ্।' (গোঃ গৃঃ সূত্র)

অপূপগুলি ভাজনা খোলা বা মালসার সমান—যেমন বড় বড় রুটী বা পরোটার আকার সেইরূপ অথবা করতল-প্রমাণ অর্থাৎ হাতের চেটোর মত হইবে, যেমন লুচি প্রভৃতির আকার। লুচি প্রভৃতির ন্যায় অপূপ-গুলিকে যে বৈদিক কালে ঘৃতসন্তলিত করা হইত তাহাও পূর্ব্বোক্ত গৃহ্যসূত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন—

শৃতানভিঘার্য্যোদগুদ্বাস্য প্রত্যভিঘারয়েৎ।

'অপূপগুলি সুপক্ব হইলে অভিঘারিত করিয়া অগ্নির উত্তরভাগে নামাইয়া পুনরায় ঘৃতে সন্তলিত করিবে।"

এই বৈদিক পূপ বা অপূপ নাম এখনও আমাদিগের কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে দেখা যায়। যেমন 'পূপ' হইতে 'পূয়া' (মালপুয়া)

‡ কপালং মৃণ্ময়ং পাত্রং চক্রাঘটিতমুচ্যতে।

আসিয়াছে। * সংস্কৃত 'পিষ্টক' শব্দ বঙ্গীয় সাধুভাষায় অপ্রচলিত না থাকিলেও বঙ্গভাষায় 'পিষ্টক'ও অনেক-গুলি প্রাকৃত শব্দেরও সৃষ্টি করিয়াছে। 'পেটালি' (গুড়ের পেটালি), 'পিটুলি' (চালের পিটুলি) 'পিঠে' ইত্যাদি অনেক গুলি প্রাকৃত শব্দ বঙ্গভাষায় পিষ্টক শব্দের বংশজাত।

বৈদিক কালে 'পূপাষ্টক' নামে একটী পার্ব্বণ বিশেষ ঋষিরা হেমন্ত বা শীতকালে পুষ্টিকর্ম্মের জন্য পালন করিতেন ; সেই সময়ে নানাবিধ অপূপ পিষ্টকাদির ঘটা পড়িয়া যাইত।

চতুরষ্টকো হেমন্তঃ। (গোঃ গৃঃ সূঃ)

বর্ত্তমানকালে পৌষমাসের 'পিঠেপার্ব্বণে' এখনো তাহার সামান্য পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি 'পিঠেপার্ব্বণের' কোন কোন পিষ্টকে 'অষ্টকা' নামটীও পর্য্যন্ত যুক্ত আছে—যেমন 'আষ্‌কে পিঠে'। 'আষ্‌কে' শব্দটী 'অষ্টকা' শব্দ হইতে উদ্ভুত।

বস্তুত শীতকালে পিঠের ধুমটা শুধু ভারতে কেন

---

* কূপ হইতে যেমন বাঙ্গলায় কুয়া (পাতকুয়া) আসিয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র। য়ুরোপ অঞ্চলে এ সময়ে ‘কেক্’, ‘পাই’, ‘পুডিং’ ‘পাফ্’ প্যাটি প্রভৃতি নানাবিধ অপূপ বা পিষ্টক-সম্ভারে দোকান পসার ভরিয়া উঠে। এ বিষয়ে য়ুরোপ যে বৈদিক ‘পূপাষ্টকা’ উৎসবের অনুসরণ করিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় ; বরঞ্চ পাশ্চাত্যেরা এই বৈদিক প্রথা আমাদের অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠাসহকারে পালন করে বলিতে হয়। বৈদিক আচার্য্যের মতে—

তা: সর্ব্বাঃ সমাংসাশ্চিকীর্ষেদিতি কৌৎসঃ। (গোঃ গৃঃ সূঃ)

“কৌৎস ঋষির মতে পূপাষ্টকা সমাংস হওয়া কর্ত্তব্য।”

এক্ষণেও দেখা যায় পাশ্চাত্যেরা যে সকল অপূপ বা পিষ্টকাদি (patty, pie প্রভৃতি) প্রস্তুত করে তাহার অধিকাংশ ‘সমাংস’।

বৈদিক সূত্রে আছে—

অষ্টকা রাত্রি দেবতা।

অর্থাৎ “অষ্টকা ক্রিয়া রাত্রিকালে করিতে হয়।” তাই য়ুরোপীয়েরা উহাদের প্রধান উৎসব পৌষপার্ব্বণ বা বড়দিন রাত্রিতেই পালন করিয়া থাকে। অবশ্য নূতন খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে প্রাচীন আচার প্রথা নব
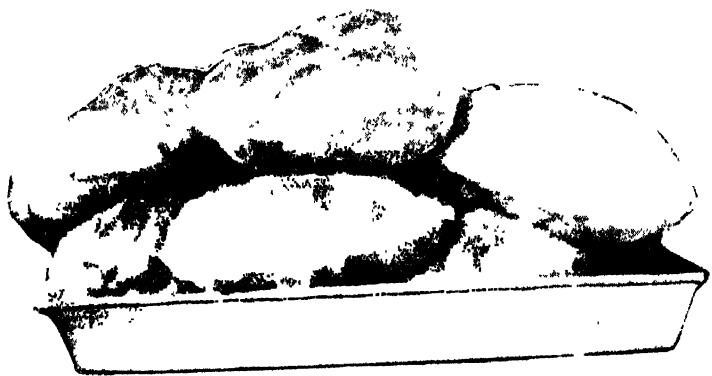
ফুল্কো লুচি

পরিচ্ছদে অনেকটা ভূষিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রাচীন প্রথার মূল ভাব বা ঠাট এখনও নষ্ট হয় নাই—অপরিবর্ত্তিতই আছে। কিন্তু যে দেশ এই অষ্টকাকর্ম্মের আদি জন্মস্থান সে দেশে ইহার প্রকৃত আচরণ একরূপ লুপ্তপ্রায়। আমাদের ভারতে পৌষপার্ব্বণে এক্ষণে আর সমাংস পিষ্টকাদি বড় একটা প্রস্তুত হয় না।

এক্ষণে দেখা যাক আমাদের দেশীয় পিষ্টক শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য লুচির উৎপত্তি হইল কিরূপে? কোন সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থেই 'লুচি' 'লুচিকা' অথবা লুচির অনুরূপ শব্দ কোন খাদ্যদ্রব্যের নামরূপে পাওয়া যায় না। 'লুচি' বস্তুত সংস্কৃত শব্দপ্রসূত নহে। কি মহাভারতাদি পুরাণ, কি বৈদিক গ্রন্থ, কি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ কোথাও 'লুচি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাবপ্রকাশের ন্যায় গ্রন্থে যাহাতে 'রুটী' 'পুরী' প্রভৃতি আধুনিক প্রায় সকল প্রকার খাবারের প্রস্তুত প্রণালী লিখিত আছে তাহাতে কিন্তু লুচির কোন উল্লেখ নাই। লুচি দেশজ অর্থাৎ বাঙ্গালার প্রাকৃত শব্দও নহে। লুচির

মূল হিন্দি ভাষায়। * লুচি প্রকৃতপক্ষে হিন্দি শব্দ। অথচ আশ্চর্য্য যে এক্ষণে বঙ্গবাসীরা যেরূপ লুচির ভক্ত হিন্দুস্থানীরা তাহার একাংশও নহে। ডালরুটী বা পুরীই পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানীদিগের রসনা পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন কি হিন্দুস্থানীরা অনেকে লুচিকেও পুরী নামে অভিহিত করে। 'পূরী' নামটী পূরাপূরী সংস্কৃত নাম। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে—

মূলকং পূরিকাপূপাঃ

"মূলক (খাদ্যবিশেষ) পূরী ও অপূপ।" †

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই ভক্ত তুলসীদাসের সময়ে 'লুচি' হিন্দুস্থানে সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ খাদ্যরূপে পরিগণিত ছিল।—ইহা তাঁহার বচন হইতেই জানিতে পারা যায়। ভক্ত তুলসীদাস বলিতেছেন—

* বিশ্বকোষে 'লুচি' দেশজ শব্দ অর্থাৎ বাঙ্গলার প্রাকৃত শব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক।

† যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১৮৮ শ্লোঃ ১ম অধ্যায়।

মাঙ্গেহুতে ন মিলে

মড়ুয়াউকি চূণ্

তুলসী রামপ্রতাপসে

লুচুই তুনো জুন্।

“পূর্ব্বে ভিক্ষা করিলে মেড়ুয়ার আটা মিলিত না কিন্তু এক্ষণে রাম নামের প্রতাপে তুবেলা লুচি পাইতেছি।” লুচি বলে কেন? কোন জিনিষ হাত হইতে পিছলিয়া পড়িবার মত হইলে হিন্দিতে ‘লুচ্-যাতা’ বলে। আবার কোন কোমল পিচ্ছিল দ্রব্যকে ‘লুচ্লুচিয়া’ বলে। লুচি সচরাচর ঘৃতে পিচ্ছিল থাকে বলিয়াই হিন্দিভাষায় ‘লুচি’ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

বৈকালিক খাদ্যে ‘লুচি’ প্রধান হইলেও পাত্ররূপ আসনে লুচি কিন্তু একাকী বসিতে চাহে না। ‘লুচি’ যখন পাত্রমধ্যে বিরাজ করে, তখন তরকারীবিহীন হইয়া শোভমান হয় না। ইংরাজী খাদ্যে যেমন ‘সস্’ খাদ্যের সহগামী হইয়া সখীর ন্যায় উহার আস্বাদের পোষণ করে, দেশীয় খাদ্যে ‘তরকারী’ অনেকটা সেইরূপ। ‘লুচি’ যেন পুরুষ, ‘তরকারী’ যেন স্ত্রী। তরকারী বলিতে

ছোঁকা, ভর্ত্তা, ভাজিভূজি ডালনা সবই আসিয়া পড়ে। 'ব্যঞ্জন' ও তরকারী একার্থবাচক, কিন্তু ব্যঞ্জন শব্দ বহু প্রাচীন। বৈদিক গৃহ্যসূত্রে ব্যঞ্জন শব্দের উল্লেখ দেখা যায়—যথা

ব্যঞ্জনৈরূপসিচ্যাগ্নৌ জুহুযাৎ।

"অন্নকে ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া আহুতি প্রদান করিবে।"

শাকং ব্যঞ্জনমন্বাহার্য্যম্।

"শাকাষ্টকায় শাক ব্যঞ্জন (তরিতর্কারি) আহরণ করিতে হইবে।" বাঙ্গালায় তরকারী একটা সাধারণ নাম। তরকারী শব্দের মূল বঙ্গীয় কোন কোন অভিধানে সংস্কৃত 'তৃপ্তিকারী' শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু 'তরকারী'র উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে 'তৃপ্তিকারী' হইতে হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে 'তর্কারী' বলিতে কর্কটি (কাঁকুড়) ও শসা প্রভৃতি কয়েকটি সবজীকে বুঝাইত। ক্রমে উহা প্রসার লাভ করিয়া সম্ভবতঃ তরকারীর উপকরণ সকল শাকসবজী-কেই বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায়

'তর্কারী' বলিতে কাঁচা শাকসবজী অপেক্ষা অধিকাংশ সময়ে রাঁধা তর্কারীই বুঝায়। ছোঁকা, চড়চড়ি, ঘণ্ট, ডালনা, ভাজিভুজি প্রভৃতি পাত-সাজান সকল সামগ্রীই তর্কারীর অন্তর্গত। তর্কারীর মধ্যে প্রধান হইতেছে ছোঁকা। সাঁতলাইবার কালে ফোড়ন দিয়া ছুঁকিয়া লইতে হয় বলিয়া ছোঁকা নাম হইয়াছে। হিন্দিতে ফোড়ন দিয়া ছুঁকিয়া লওয়াকে 'তড়কা'ও বলে। 'ছুঁক' ও 'তড়কা' শব্দদ্বয় প্রায় একার্থবাচক ; যথা, "করাহীমে ঘী ডাল্ হীংকা তড়্কা দেবে" অর্থাৎ "কড়ায় ঘি ঢালিয়া হিংএর ফোড়ন দেবে।" এই 'তড়কা' শব্দ হইতেই বা 'তড়কারী' বা 'তরকারী' আসে নাই তা কে বলিবে ! দেখা যায় তরকারীজাতীয় অধিকাংশ খাদ্যের নাম ফোড়ন-সংস্পৃষ্ট। বাঙ্গালায় চড়চড়ি নাম ফোড়ন দিবার কালে চড়্চড়্ শব্দ হইতে হইয়াছে। 'ছোঁকা'র 'ছোঁক' শব্দটীও ফোড়ন দিবার কালে 'ছ্যাঁক ছোঁক' আওয়াজ হইতে উদ্ভূত। যেখানে ছোটখাট তরকারী রান্নায় 'ছুঁক' বা 'তড়্কা' প্রযুক্ত, সেখানে পোলাও প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে অনেক সময়ে 'বঘার' শব্দটা ব্যবহৃত হয়।

'বঘার' শব্দ শুনিয়া যেন কেহ ভয় না পান। আসলে ইহা উর্দ্দু বা মুসলমানী শব্দ নয়। বাঙ্গালায় 'সাঁতলান'র যে অর্থ মুসলমানী 'বঘার' শব্দেরও সেই অর্থ। 'বঘার' ছদ্মবেশী বৈদিক 'অভিঘারণ' শব্দ। ঘৃত-সন্তলিত করার নাম 'অভিঘারণ'—বৈদিক যজ্ঞে অভিঘারণ কথায় কথায়। *

বাঙ্গালা তরকারীর মধ্যে কোন কোনটার নাম যে হিন্দুস্থানী হইতে আসিয়াছে তাহা শব্দের ঠাট দেখিয়া বুঝা যায়, যেমন 'ডালনা'। 'ডালনা' অর্থাৎ তরকারীর মধ্যে যাহা তরল বা 'ঢালিবার যোগ্য'। 'ভড়্তা' শব্দটা সংস্কৃতমূলক। সংস্কৃত 'ভটিত্র' হইতে 'ভড়্তা' আসিয়াছে। শূলপক্ক মাংসাদির (অর্থাৎ শিক-কবাব) নাম সংস্কৃতে "ভটিত্র"। শূলপক্ক মাংস আসলে পূর্ব্বে হিন্দুদেরই খাদ্য ছিল—কিন্তু এখন মুসলমানেরা উহাদের নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। "ভট" অর্থে যোদ্ধা—

* মাংস সন্তলনের যে ঘৃত বা চর্বি তাহাকে ইংরাজীতে 'Gravy' বলে ; ইহা 'অভিঘারিত' শব্দের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

“ভটা যোদ্ধাশ্চ যোদ্ধারঃ” (অমর)। শিককাবাবের ন্যায় ঝলসানো মাংস যোদ্ধাদের প্রিয় খাদ্য, তাই ‘ভটিত্র’ নাম হইয়াছে। সেই ঝলসানো মাংসের পরিবর্ত্তে আজ পোড়া বেগুনের নাম “ভটিত্র”! বেগুনকে মাংসের ন্যায় শলাকায় বিদ্ধ করিয়া আগুনে পোড়াইতে হয় তাই বেগুন-পোড়ার নাম “ভড়্তা”। সংস্কৃত ‘ভটিত্র’ শব্দের অপভ্রংশ হইয়া ‘ভড়তা’ হইয়াছে। তরকারীর মধ্যে অন্যান্য খাদ্যগুলির মূল সহজেই নির্দ্দেশ করা যায় বলিয়া তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আহারের রসাস্বাদন অপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যের ইতিহাস, তত্ত্বান্বেষণে অধিকতর তৃপ্তি। খাবারের একটী কথা কত পূর্ব্বকাল হইতে পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিচিহ্ন, তাঁহা-দের জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রাণের রুচি ও তৃপ্তি বহন করিতেছে, সেইটা যদি আজ আমরা কোনরূপে জানিতে পারি তাহা হইলে সে রসাস্বাদনে আমাদের কত না আনন্দ! এই প্রবন্ধে পাঠকগণ লুচি তরকারী হাতে হাতে লাভ করিয়া আহারের মূর্ত্তিমান সুখের পরিবর্ত্তে সেই অমূর্ত্ত রসাস্বাদন করিতে পাইবেন।

এককালে হিন্দুর প্রাচীন আচার প্রথা যে দেশ-বিদেশে শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হইয়াছিল, পিষ্টকজাতীয় খাদ্যসমূহের নাম হইতেও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় অধিকাংশ পিষ্টকাদির নামগুলি বৈদিক সংস্কৃত বা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। দেখুন 'পাই' একটী ইংরাজজাতির প্রাচীন খাদ্য "Not only the word pie but also the dish, are peculiarly national to England, and interwoven with the history of its culture." *—ইহা সমাংস 'পূপ' ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'পূপ' ও 'পাই' উহারা একই শ্রেণীর খাদ্য। আমাদের বাঙ্গলায় বৈদিক 'পূপ' যখন 'পুয়া' হইতে পারিয়াছে তখন দূর ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'পূপ' বিকৃত হইয়া 'পাই' হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। 'পুয়া' ও 'পাই' ইহারা উভয়েই বৈদিক 'পূপ' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। ইংরাজী 'পফ্' শব্দ ত একেবারেই 'পূপ' ছাড়া আর কিছুই নহে। সংস্কৃত পিষ্টক শব্দও য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে বিশেষভাবে সমাদৃত হই-

* J. L. W. Thudichum, M. D.

য়াছে দেখা যায়। লুচি রুটীর শ্রেণীর খাদ্যকে ইংরাজীতে 'পেষ্ট্রী' (pastry) বলে। এই 'pastry' শব্দ যে পিষ্টক শব্দ প্রসূত তাহা শব্দের আকার ও অর্থসাদৃশ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত। Pastry, pastil (মিষ্ট পিষ্টক বিশেষ), patti, এ সকলি সংস্কৃত পিষ্টক শব্দপ্রসূত।

আবার দেখুন 'অমলেট্'। বাঙ্গলায় 'অমলেট'এর এখন খুব আদর; আম্লেট্ আমাদের জিনিষ, আমরা আবার ফিরিয়া পাইয়াছি। Omelett এটা কি ইংরাজী শব্দ মনে করেন? প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। অমলেট জিনিষটা কি প্রথমে বলিয়া দিই—ডিম ও ময়দা সংযোগে ঘৃত-ভর্জ্জিত রুটীবিশেষ, ভাজনা খোলা বা ফ্রাই প্যানে অর্থাৎ তাওয়ায় ভাজিতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ Chambers এর অভিধানে Omelett এর মূল লাটিণ 'লামিনা' (যাহার অর্থ পাতলা পাত) লিখিত হইয়াছে; কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাই ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন। অনেকের মতে—"অমলেট' ফরাসী শব্দ, কারণ বহু প্রাচীন ফরাসী গ্রন্থে 'অমলেট' এর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইহার মূল যে কি তাহা এখনও জানা

যায় নাই।" * বৈদিক 'অম্বরীষ' শব্দ যাহার অর্থ 'ভাজনা খোলা' বা রুটী প্রভৃতি ভাজিবার পাত্র, † আমার মনে হয় সেই সংস্কৃত শব্দ হইতে Omelett এর উৎপত্তি। 'অম্বরীষ' শব্দের 'র' 'ল'তে এবং 'ষ' 'ট'তে পরিণত হইয়া 'অমলেট' হইয়াছে। রলয়োরভেদঃ ইহা ত সর্ব্বজন-বিদিত। 'শ' বা 'ষ' যে 'ট'তে এবং 'ট' যে 'শ' বা 'ষ'তে রূপান্তরিত হয়, ভাষাতত্ত্বে তাহারও উদাহরণের অভাব নাই। যেমন 'শিখা'র 'শ' ট হইয়া 'টিকি' হইয়াছে। 'কাটলেট' খাদ্যবিশেষের নাম পাচকেরা অনেক সময়ে 'কাটলেষ' বলিয়া থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভাজিবার পাত্রের নাম 'অম্বরীষ' হইতে 'অম্‌লেট' হইয়াছে। যেমন আরেকটী আমলেটজাতীয় ইংরাজী খাদ্যের নাম Pan-

* It is undoubtedly of French origin, and in ancient work is spelled amelettle, but its etymological derivation is uncertain. (The spirit of cookery.)

† অমর কোষের মতে "অম্বরীষ" ও "ভ্রাষ্ট্র" উভয়ই একার্থ-বাচক; উভয় শব্দের অর্থ ভাজিবার বা সেঁকিবার "তাওয়া" বা Frypan জাতীয় পাত্র।

cake ভাজিবার পাত্রের নাম হইতে আসিয়াছে। আপনারা বলিবেন বৈদিক ভাজিবার পাত্র বিলাতে কিরূপে গেল? আমি বলি যেমন আজকাল আমাদের সব জিনিষ চালান হইতেছে সেইরূপ চিরকাল উহারা আমাদের খাইয়া মানুষ। আমাদের যজ্ঞীয় 'চমস' উহারা সদাসর্ব্বদা 'চামচ'রূপে ব্যবহার করে। দেখুন আমাদের রাঁধিবার হাঁড়ির 'তিজেল' নামটী পর্য্যন্ত জর্ম্মণ ভাষায় গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু কোন্ সময়ে যে উহা গৃহীত হয় তাহার কোন ইতিহাস নাই। জর্ম্মন-ভাষায় চওড়ামুখওয়ালা রাঁধিবার হাঁড়িকে Tiegel বলে, ইংরাজীতে যাহার নাম সস্প্যান। আমাদের ঐ হাঁড়িকে 'তিজেল' বলে কেন না উহা তেজ-সহ।

এইবারে দেখাইব ইংরাজের জীবন ধারণের প্রধান খাদ্য Breadও উহাদের নিজস্ব নহে। প্রাচীন রোমীয় সভ্যতার কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ময়দা-গোলাই উহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। তারপরে যখন সেই ময়দাগোলা বিশেষরূপ অগ্নিপক্ক করিয়া খাইতে শিখিল তখন তাহার (পায়সবৎ পদার্থের) নাম দিল porridge (লাটিন

পরাটা *) অর্থাৎ ভর্জ্জিত বা অগ্নিপক্ক। According to Cato, the old Romans had been reared upon gruel, and this soup like preparation was down to our days the general or occasional food of entire population. When gruel was superseded by better preparations, e. g. porridge, it was limited to the breakfast table. তারপর আরেকটু অগ্রসর হইয়া যখন ঐ ময়দা-গোলা ভর্জ্জনপাত্রে সেঁকিয়া খাইতে শিখিল তখন Bread নাম হইল। Bread শব্দটী রুটী সেঁকিবার পাত্র 'ভ্রাষ্ট্র' নাম হইতে আসিয়াছে। যেমন মহারাষ্ট্র হইতে 'মরাঠা' হয় তেমনি 'ভ্রাষ্ট্র' হইতে 'ভ্রাঠ'। এই 'ভ্রাঠ' জার্ম্মণ ভাষায় 'ব্রট' এবং ক্রমে ইংরাজীতে ব্রেড্ Bread হইয়াছে। যাহা 'ভ্রাষ্ট্র' বা তাওয়ায় ভাজা যায় তাহাই Bread। প্রথমাবস্থায় য়ুরোপে এইরূপ সেঁকারুটীই প্রচলিত ছিল। জর্ম্মন ভাষায় ঘৃত সম্বরিত (ঘিয়ে

* লাটিন 'পরাটা' শব্দের সঙ্গে আমাদের "পরটা" শব্দের তুলনা কর। 'পরটা'র উৎপত্তি সংস্কৃত 'ভ্রাষ্ট্র' শব্দ হইতে।

সেঁকা) রুটীর নাম 'সমারন্'। 'সমারন্' সংস্কৃত পাক-শাস্ত্রের 'সম্বরন' শব্দ হইতে উৎপন্ন। যাহা হইতে আমাদের বাঙ্গলায় ঘিয়ে 'সম্বরে' নেওয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে যে মাদক দ্রব্য সংযোগে য়ুরোপীয়েরা পাঁওরুটী তৈয়ারী করে ইহা য়ুরোপের জিনিষ নহে, আসিয়ার আবিষ্কৃত। * এই বর্ত্তমান যুগেও আমাদের রুটী প্রভৃতি শব্দ য়ুরোপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল দেখিতেছেন বিদেশীয়েরা আমাদের চাল ডাল লইয়া পুষ্ট হইতেছে, কিন্তু ইহা তুচ্ছ মনে হয় যখন দেখি অতি পুরাকাল হইতে ভারতের ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে উহারা শব্দসমূহ ও জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া নিজ নিজ দেশকে পুষ্ট করিয়াছে।

* Leavened bread was perhaps first made by the chinese.

The spirit of cookery

J. L. W. Thudichurn, M. D

† ভারতের পঞ্জাবপ্রদেশেও খামিরকে মগুভাবাপন্ন করিয়া তাহা হইতে রুটী প্রস্তুত করা বহুকাল হইতে প্রচলিত।

তামাক ও ধূমপান। *

নেশার বস্তু যেমন শীঘ্র লোকপ্রিয় হয় এমন অন্য কোন জিনিষ নহে। কিন্তু ধূমপানকে ঠিক নেশার জিনিষ বলা যায় কিনা সন্দেহ, বরঞ্চ আয়েশের জিনিষ বলিতে পারা যায়। ধূমপান বলিলে আজকাল লোকে আর অন্য কোন দ্রব্যের ধূমপান বড় একটা বুঝে না, তামাকুসেবনই বুঝে। তামাকুসেবন ও ধূমপান যেন এক কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তামাক আয়েশের সামগ্রী হইলেও উহাতে নিকটিন নামে এমন এক বিষাক্ত পদার্থ আছে যাহা শরীরের বিশেষ অপকারক। কিন্তু যাঁহারা তামাকের আয়েশে একবার মজিয়াছেন

* ১৩৩৫ সালের ২৬শে পৌষে সাহিত্য-সভার অধিবেশনে প্রপঠিত।

তাঁহাদের পক্ষে উহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। নেশার জিনিষ অর্থে যদি মাদকদ্রব্য বুঝায় ত তামাক সে শ্রেণীর পদার্থ নয়, কিন্তু নেশার জিনিষ বলিতে যদি আসক্তির দ্রব্য বুঝায় ত তামাক নেশার মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তামাকে মাদকতা না থাকিলেও উহার আকর্ষণী শক্তি যথেষ্ট। যিনি একবার তামাক ধরিয়াছেন তিনি উহা সহজে ছাড়িতে পারেন না—তাহাতে যেন আসক্ত হইয়া পড়েন।

আজকাল এই তামাকের কত সাজসজ্জা কত বেশভূষা! আতর গোলাপ প্রভৃতি নানা সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা কতরূপে যে উহাকে সৌখিন বিলাস-সামগ্রীতে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহার কত না আদর, কত না সোহাগ! তামাকের প্রসার আজ সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটী রূপার গড়গড়া দেখিলে মনে হয় যেন কুহকিনী তাম্রকুটী নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া হাবভাবে লোকের চিত্তাকর্ষণের জন্য কটাক্ষ করিতেছে। কুণ্ডলাকৃতি নলিকা যেন বেণীর ন্যায় দোলায়মানা।

ইহার বেশভূষা ইহার অলঙ্কারের জন্য কত বহুমূল্য আসবাব বিপণিতে বিপণিতে সুসজ্জিত। শ্যামাঙ্গীর পদরেণুটুকু মুছাইবার জন্য কত না সরঞ্জাম। সহস্র সহস্র প্রকারের স্বর্ণরৌপ্য Ash tray প্রভৃতি সেই পদরেণু লাভে যেন কৃতার্থ। কি য়ুরোপ কি আসিয়া প্রায় সকল দেশেই তামাকের অপকারিতা বুঝিয়া এবং উহা বিলাসসাগরে লোককে নিমগ্ন করে দেখিয়া উহার অপসারণের জন্য এককালে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল ; এমন কি রুষিয়া ও তুরস্ক দেশে তামাকু সেবনের শাস্তি নাসিকাচ্ছেদন পর্য্যন্ত ঘোষিত হয়। কিন্তু উহার মোহিনী শক্তি বলে আজ পর্য্যন্ত উহাকে কেহ রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই—সকল রাজাজ্ঞা সকল শাস্ত্রের আদেশ উহার নিকট ব্যর্থ হইয়াছে।

আমি তামাকের গুণদোষ বিচার করিতে এখানে উপস্থিত হই নাই। তবে শ্রোতৃবর্গকে তামাকের জন্ম-বৃত্তান্ত উৎপত্তি কথা যাহাতে শুনাইতে পারি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তামাকের জন্ম স্বদেশে কিম্বা উহা বিদেশ হইতে আনীত এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য

আমি আজ উপস্থিত। বিদেশানীত তামাক ভারতে প্রথম য়ুরোপীয়েরা প্রচলন করেন, এই পাশ্চাত্য মত যে নির্বিচারে আমাদের দেশের বিদ্বৎসমাজে গৃহীত হইয়াছে তাহা সত্য কি ভ্রান্ত আজ তাহাই নিরূপণ করিব।

তামাকের কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমে আমাকে ধূমপানের ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বস্তুতঃ ধূমপানের উৎপত্তি বড় আজকালের কথা নহে। ধূমপান মানবের আদিম যুগ বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত। বৈদিক যুগে ঋষিরা সদাসর্ব্বদাই হোম বা যজ্ঞধূম সেবন করিতেন। ঋষিরা ঘৃতের ভক্ত ছিলেন, তাই সচরাচর ঘৃতসম্পৃক্ত ধূম সেবন করিতে ভাল বাসিতেন। বৈদিক কালের এই ধূমসেবন প্রকৃতপক্ষে সকল ধূমসেবনের মূল বলিতে পারা যায়। বৈদিক ঋষিরা ঘৃত যব তিল প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থের হোমোত্থিত ধূম পান করিতেন এবং তাঁহাদের প্রিয়জন ও দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেন।

এই সকল পবিত্র দ্রব্যের ধূমপান পুরাকালের

পবিত্রচিত্ত ঋষিদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। তৎপরে বেদকনিষ্ঠ অথর্ববেদের কালে আভিচারিক কার্য্যাদির জন্য নানাবিধ মাংস ও অন্যান্য ঘৃণ্য পদার্থের ধূমসেবনের প্রচলন হইল। অথর্ববেদের শাখা আয়ুর্ব্বেদ এইখান হইতেই ধূমপান লাভ করিয়া উহাকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসুখসাধনে নিয়োগ করিল। শারীরিক সুখ-বিধানের জন্য আয়ুর্ব্বেদ নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা নানা উপায়ে ধূমপানের পরিচালনে ত্রুটী করিল না। প্রকৃত-পক্ষে ভারতের আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমান ধূমপানবিধির প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। ধূমপানকে সহজায়ত্ত ও সুগম করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ঋষিগণ নানা যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের প্রবর্ত্তিত সেই সকল যন্ত্রই ঈষৎ পরিবর্ত্তিতাকারে আজকাল হুক্কা, গুড়গুড়ি, পাইপ প্রভৃতিরূপে বিরাজমান।

কিন্তু এইরূপে ক্রমে ধূমপান দুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ, কোন আধারে দ্রব্যাদি রাখিয়া তাহার ধূম বায়ুসম্পৃক্ত হইলে ধীরে ধীরে

তাহার আঘ্রাণ বা সেবন। ধূপ ধুনা ও যজ্ঞ হোমোত্থিত ধূমসেবন এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এই শ্রেণীর ধূমসেবন সচরাচর ধর্ম্মকর্ম্ম বা দেবসেবার সহিত জড়িত হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ যন্ত্র সাহায্যে মুখাগ্র বা নাসার দ্বারা ধূমগ্রহণ। এই দ্বিতীয় প্রকার ধূমসেবনই সচরাচর ধূমপান নামে সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

ধূমপানের উপকরণ নানাবিধ দ্রব্য। গঞ্জিকা চরস প্রভৃতি নেশার জিনিষ এবং তামাকের ধূমপানই অধুনা বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু পুরাকালে রোগনিরাকরণের জন্য নানাবিধ দ্রব্যের ধূমপান বিশেষ ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে বৈদ্যমহলে সে সকলের বড় একটা প্রচলন নাই। বরঞ্চ ডাক্তারেরা কোন কোন রোগে ধূমপানের প্রয়োগ করেন। শ্বাস কাস বা গলরোগে কোন কোন স্থলে নব্য ডাক্তারদিগকে ঔষধাদিযোগে ধূমপানের ব্যবস্থা দিতে দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যবস্থা নূতন নহে—ভারতের চরকে শ্বাস প্রভৃতি রোগের প্রশমনের জন্য কতকাল পূর্ব্বে যে ধূমপানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেদিকে একবার লক্ষ্য করুন।—

মধূচ্ছিষ্টং সর্জরসং ঘৃতং মল্লকসম্পুটে।
কৃত্বা ধূমং পিবেৎ শৃঙ্গং বালং বা স্নায়ু বা গবাং॥

"মোম, ধুনা ও ঘৃত অথবা গোপুচ্ছলোম বা গোস্নায়ু মল্লকসম্পুটে * (আধার বিশেষে) যথানিয়মে স্থাপন পূর্ব্বক ধূমপান করিবে।

(চরক শ্বাসচিকিৎসা)

আয়ুর্ব্বেদে যত প্রকার ধূমসেবনের বিধান আছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।—

ধূমস্তু ষড়্বিধঃ প্রোক্তঃ শমনো বৃংহণস্তথা।
রেচনঃ কাসহাচৈব বামনো ব্রণধূমনঃ॥

"ধূম ছয় প্রকার—রোগশমন, বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকর, রেচন, কাসঘ্ন, বমনকারী ও ব্রণধূমন।"

ধূমপানের যে কত গুণ কি সুফল তাহাও আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে।—

* 'মল্লক' হইতে আমাদের বাঙ্গলায় 'মালা' শব্দ আসিয়া থাকিবে,—যথা, 'নারিকেলের মালা'। 'মল্লক সম্পূট' অর্থাৎ ঢাক-নিযুক্ত মালা

কাসশ্বাস প্রতিশ্যায়ামন্যাহনুশিরোরুজঃ।
বাতশ্লেষ্মবিকারাংশ্চ হন্যাদ্ধূমঃ সুযোজিতঃ॥

"ধূম সুযোজিত হইলে কাস শ্বাস প্রতিশ্যায় মন্যা হনু ও শিরঃপীড়া এবং বাতশ্লেষ্মবিকারের শান্তি হয়।"

পুনশ্চ—

নরো ধূমোপযোগাচ্চ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনঃ।
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রু-সুগন্ধি বিশদাননঃ॥ (সুশ্রুত)

"ধূমসেবনে মানবের ইন্দ্রিয় বাক্য ও মন প্রসন্ন হয়, কেশ দন্ত ও শ্মশ্রু দৃঢ় হয় এবং মুখ সুগন্ধি ও বিশদ হয়।"

মুখের অরুচি ও বৈরস্য দূর করিবার জন্য চরক মুখধৌতির পর ধূমপানের আদেশ দিয়াছেন। *

স্নাত্বা ভুক্ত্বা সমুল্লিখ্য ক্ষুত্বা দন্তান্ বিঘৃষ্য চ।
নাবনাঞ্জননিদ্রান্তে চাত্মবান ধূমপো ভবেৎ॥"
(চরক সূত্রস্থান ৫ম অধ্যায়)

"স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে, হাঁচি হইলে, দন্তধাবনান্তে, নস্যদ্বারা শিরোবিরেচনান্তে, নিদ্রান্তে এবং অঞ্জনান্তে পথ্যাশী ব্যক্তি ধূমপান করিবেন।"

* চরক চিকিৎসাস্থান ৮ম অধ্যায়

মহর্ষি চরক ধূমপানের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা একবার শ্রবণ করিলে ধূমপানের বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলিতে কেহ সাহসী হইবেন না।—

"গৌরবং শিরসঃ শূলং পীনসার্দ্ধাবভেদকৌ।
কর্ণাক্ষিশূলং কাসশ্চ হিক্কাশ্বাসৌ গলগ্রহঃ।
দন্তদৌর্ব্বল্যমাস্রাবঃ স্রোতোঘ্রাণাক্ষিদোষজঃ।
পূতিঘ্রাণস্য গন্ধশ্চ দন্তশূলমরোচকঃ।
হনুমন্যাগ্রহঃ কণ্ডু ক্রিময়ঃ পাণ্ডুতা মুখে।
শ্লেষ্মপ্রসেকো বৈস্বর্য্যং গলশুণ্ড্যুপজিহ্বিকা।
খালিত্যং পিঞ্জরত্বঞ্চ কেশানাং পতনন্তথা।
ক্ষবথুশ্চাতিতন্দ্রা চ বুদ্ধেমোহোঽতিনিদ্রতা।
ধূমপানাৎ প্রশাম্যন্তি বলং ভবতি চাধিকং।
শিরোরুহকপালানামিন্দ্রিয়াণাং স্বরস্য চ॥"

(চরক সূত্রস্থান ৫ম অধ্যায়)

"অঙ্গগৌরব, শিরঃশূল, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, কাস, হিক্কা শ্বাস, গলগ্রহ, দন্ত-দৌর্ব্বল্য, কর্ণ নাসা এবং অক্ষি হইতে স্রাব, মুখ এবং নাসিকার দৌর্গন্ধি, দন্তশূল, অরুচি, হনুগ্রহ, কণ্ডু, কৃমি,

মুখের পাণ্ডুতা, শ্লেষ্মপ্রসেক, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, উপ-জিহ্বক, খালিত্য, পিঞ্জরত্ব, কেশপতন, হাঁচি, অতিতন্দ্রা, বুদ্ধিভ্রম, অতিনিদ্রা, ধূমপান করিলে এই সকল প্রশমিত হয়, শরীরের বল বৃদ্ধি হয় এবং কেশকলাপ ইন্দ্রিয় ও স্বরের দার্ঢ্য হয়।"

এত গুণব্যাখ্যা দেখিয়াই বোধ হয় ধূমপান সকলের এরূপ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই যে আয়ুর্ব্বেদের ধূমপান ইহা কেবলমাত্র তামাকের ধূমপান নহে। সাধারণতঃ নানাবিধ ঔষধ-দ্রব্যের ধূমপান। তবে তাহাদের মধ্য হইতে তামাক যে একেবারে বাদ পড়িয়াছে তাহা নহে। চরক সুশ্রুতের কালে তামাকেরও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উহা সে সময়ে শিরোবিরেচক-গণের মধ্যে গণ্য হইত। তবে ঠিক তামাক নামটা সেকালে চলিত ছিল না। সাধারণত তামাক 'তমাল' বা 'তমালপত্র' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুশ্রুতে যে শিরোবিরেচকগণের উল্লেখ আছে তাহা হইতে তমালপত্র বাদ যায় নাই—

"পিপ্পলী বিড়ঙ্গাপামার্গশিগ্রু সিদ্ধার্থক শিরীষমরিচ

করবীর-বিম্বী গিরিকর্ণিকাকিণিহী বচা জ্যোতিষ্মতী করঞ্জার্কালর্ক লশুনাতিবিষাশৃঙ্গবের তালীশ তমাল সুরসার্জ্জকেঙ্গুদীমেষশৃঙ্গী মাতুলুঙ্গী মুরুঙ্গী পীলুজাতী শাল তাল মধুক লাক্ষাহিঙ্গুলবণমদ্য গোশকৃদ্রসমূত্রাণীতি শিরোবিরেচনানি। তত্র করবীরপূর্ব্বাণাং কন্দাঃ। করবীরাদীনামর্কান্তানাং মূলানি। তালীশপূর্ব্বাণাং কন্দাঃ তালীশাদীনামর্জ্জকান্তানাং পত্রাণি। ইঙ্গুদী মেষশৃঙ্গীত্বচৌ। মাতুলুঙ্গীপীলুজাতীনাং পুষ্পাণি। শালতালমধূকানাং সারাঃ। হিঙ্গুলাক্ষে নির্য্যাসৌ।"

"পিপুল্ বিড়ঙ্গ, আপাঙ্গ, শজিনা, শ্বেতসর্ষপ, শিরীষ, মরীচ, করবীর, তেলাকুচা, অপরাজিতা, কটভী, বচ, লতাফটকী, করঞ্জ, আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, লশুন, আতইচ, শুঠ, তালীশপত্র, তমালপত্র, সুরসা-পত্র (তুলসী) অর্জ্জকপত্র (বাবুই) তুলসী), ইঙ্গুদী, মেড়াশৃঙ্গী, মাতুলুঙ্গী (গোঁড়ানেবু), রক্তপুষ্প সজিনা, পীলু, জাতী, শাল, তাল, মৌল, লাক্ষা, হিঙ্গু, মদ্য, গোময়, গোরস ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্য শিরো-বিরেচক। তন্মধ্যে পিপুল হইতে মরিচ পর্য্যন্ত দ্রব্যের

ফল, করবীর হইতে আকন্দ পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল, অর্ক অর্থাৎ শ্বেত আকন্দ হইতে শৃঙ্গবের পর্য্যন্ত দ্রব্যের কন্দ, তালীশ হইতে আর্জ্জক দ্রব্যের পত্র, পর্য্যন্ত দ্রব্যের পত্র, ইঙ্গুদী ও মেড়াশৃঙ্গীর ত্বক, মাতুলুঙ্গী, মুরুঙ্গী (রক্তপুষ্পসজিনা) পীলু ও জাতীয় পুষ্প, শাল তাল ও মৌলের সার, হিঙ্গু ও লাক্ষার নির্য্যাস শিরোবিরেচনার্থ প্রয়োজ্য।"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৯ অধ্যায়)

সুশ্রুতের উপরোদ্ধৃত বচনেই দেখিলেন 'তালীশ হইতে অর্জক পর্য্যন্ত দ্রব্যের পত্র' অর্থাৎ তালীশপত্র, তমালপত্র, সুরসা তুলসীপত্র ও অর্জক তুলসীপত্র এই গুলির পত্র শিরোবিরেচনে প্রয়োজ্য। চরকেও নানা নানা ঔষধে শ্লেষ্মানাশক বা শিরোবিরেচক, দ্রব্যের সঙ্গে তমালপত্র ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।*

কিন্তু এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত তমালপত্র যে প্রকৃতই

* উদাহরণরূপে চরক চিকিৎসাস্থান, ৩য় অধ্যায় উষ্ণাভিপ্রায়িক জ্বররোগের ঔষধ অগুর্ব্বাদি তৈল দেখ।

তামাক তাহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ, তমাল বা তমালক ও তামাক উভয়ের নামের সাদৃশ্য। † দ্বিতীয়তঃ, আয়ুর্ব্বেদে তমালপত্রকে যেরূপ শিরো-বিরেচকগণের মধ্যে ধরা হইয়াছে, বর্ত্তমান কালেও সেরূপ দেখা যায় তামাক শিরোবিরেচক নস্যরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়তঃ, যখন দেখি অতি প্রাচীনকালেও লোকে তমালপত্র প্রভৃতি শিরোবিরেচক দ্রব্যের ধূমপান করিত, তখন তমালপত্র যে তামাক সে বিষয়ে অল্পই সন্দেহ থাকে। শিরোবিরেচক দ্রব্যের দ্বারা ধূমপানের গুণের কথা সুশ্রুতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

† তমাল ও তমালক শব্দদ্বয় একার্থবাচক। রামায়ণে 'তমাল' কোন কোন স্থলে 'তমালক' শব্দরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।—যথা, ততঃ সরলতালশ্চ তিলকাঃ সতমালকাঃ' (অযোধ্যা কাং, ৯১ সর্গ, ৫১ শ্লোক) এই 'তমালক' শব্দের 'ল' 'র' হইয়া অপভ্রষ্টাকারে 'তামাক' হইয়াছে। তমালক = তমারক = তাম্রাক = তামাক। মালয় পেনিনসুলাবাসী অসভ্যেরাও তামাককে 'তাম্রাক' বলে।

"বৈরেচনঃ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশ্যাপকর্ষতি রৌক্ষাৎ তৈক্ষ্ণ্যা-দৌষ্ণ্যাদ্বৈশদ্যাচ্চ।"

"বৈরেচন ধুম রৌক্ষ্য, তৈক্ষ্ণ্য, ঔষ্ণ্য ও বৈশদ্য গুণে কফকে উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) করিয়া নিঃসারণ করে।"

(সুশ্রুত চিকিৎসাস্থান ৪০ অধ্যায়)

তমালপত্র যে প্রকৃতই তামাক স্কন্দপুরাণের কথায় সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। চরক সুশ্রুতের কালে দেখি ঔষধস্বরূপে শিরোবিরেচনাদির জন্য বা শ্লেষ্মাদূরীকরণের জন্য তমালপত্রের ধূমপান ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তৎপরে ক্রমে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পৌরাণিক যুগে তমালপত্রের ধূমপান অতিমাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল ;—যেমন আজ-কাল অল্পদিন মধ্যে চাপানের প্রচলন অপ্রতিহত ভাবে চলিয়াছে অনেকটা সেইরূপ। তাই স্কন্দপুরাণ দেখিতে পাই ধূমপানের প্রসঙ্গে একমাত্র তমালপত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তমালপত্রের ধূমপান অতিমাত্রায় সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইয়া দেশময় উহার কুফল

প্রসব করিতে লাগিল তখন পুরাণকার উহার প্রতি-বিধানে উদ্যত হইলেন। সেই সময় পুরাণে উহার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল। তাই পুরাণকার ঋষি তমালপত্রের ধূমপানে লোকে মহানরকে পতিত হইবে ইত্যাদি ভীতিপ্রদর্শনে উহা সেবন করিতে সকলকে নিষেধ করিতেছেন।—

ধূম্রপানেন ভো প্রেতাঃ প্রেতত্বঞ্চৈব জায়তে।
কলৌ তু কলিরূপং হি তমালমেব জায়তে॥

*　　　*　　　*　　　*

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাঃ নরাঃ।
নরকেষু পতিষ্যন্তি তমালস্য চ পানতঃ॥
উপাসন্তে তমালং বৈ কলৌতু পুরুষাধমঃ।
ক্ষীণপুণ্যা পতিষ্যন্তি মহারৌরবসংজ্ঞকে।
অভক্ষ্য ভক্ষণাৎ পাপমগম্যাগমনাচ্চ যৎ।
মদ্যপানাচ্চ যৎ পাপং ধুম্রপানস্য মাত্রতঃ॥ *

* স্কন্দপুরাণ মথুরাখণ্ড ৫২ অধ্যায়—পাঞ্জাব প্রদেশের প্রকাশিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

"ধূম্রপানকারীরা মরিয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। কলিতে তমালপত্র কলিরূপ হইয়া জন্মিয়াছে। ঘোর কলি আসিলে সকল বর্ণাশ্রমীরাই তমালপত্র সেবনে নরকে পতিত হবে। যাহারা পুরুষাধম তাহারাই কলিতে তমালের উপাসনা করিবে; তাহাতে তাহারা ক্ষীণপুণ্য হইয়া মহারৌরব নরকে পতিত হইবে। অভক্ষ্য ভক্ষণের যে পাপ অগম্যাগমনের যে পাপ মদ্যপানের যে পাপ ধূমপানে সেই পাপ হয়।"

স্কন্দপুরাণোক্ত এই তমালের ধূমপান তামাকের ধূমপান ব্যতীত আর কি মনে হয়? বস্তুতঃ তমাল ও তামাক একই বস্তু। কলিতে ধূমপানের জন্য লোকে আর অন্য কোন্ বস্তুর উপাসনা করে? ধূমপানের সহিত একাত্মভাব তামাক ব্যতীত জগতে অন্য কোন্ জিনিষের দেখা যায়? স্কন্দপুরাণ বড় আজকালের পুরাণ নহে, ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল অবগত হওয়া যায়। ইহা যে কত পুরা-কালের তাহার আভাস দিবার জন্য কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করিলাম,—Independent

proof of the existence of the Skandapurana at the same period afforded by a Bengal Manuscript of that work, written in Gupta hand, to which as early a date as the middle of the seventh century can be assigned on palaegraphical grounds. * অর্থাৎ স্কন্দপুরাণের যে বঙ্গীয় গুপ্ত অক্ষরের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া ইহা স্থির বলা যায় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে ইহার প্রচলন ছিল।

পদ্মপুরাণের কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'তমাল' পত্রের উৎপত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে দেখি তমালপত্র গোকর্ণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

গোলোকে গরুড়ো গোভির্যুদ্ধং চৈব চকার সঃ।
গরুড়স্য তুণ্ডেন পুচ্ছকর্ণাস্তদাঽপতন্ ॥

* The Early History of India by Vincent A, Smith,

রুধিরং চ পপাতোর্ব্যাং ত্রীণি বস্তূনি চাভবন্।
কর্ণেভ্যশ্চ তমালং চ পুচ্ছাদ্গোভী বভূব হ ॥

"গরুড় গোলোকে গিয়া গোগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। গরুড়ের তুণ্ডাঘাতে পৃথিবীতে গোগণের রুধির, পুচ্ছ ও কর্ণ পতিত হইল। কর্ণ হইতে তমাল, পুচ্ছ হইতে গোভী উৎপন্ন হইল।" † তমালপত্র গোকর্ণের সমগুণাত্মক কিনা বলিতে পারি না কিন্তু তমালপত্রের আকার অনেকটা গোকর্ণের সদৃশ। তবে এইটুকু বলা যায় যে চরক ও সুশ্রুতে তমালপত্র গোশকৃদ্রস গো-স্নায়ু ও গোপুচ্ছ এইগুলিকে শ্লেষ্মানাশক বা শিরোবিরেচকগণের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এই গুলি সম্ভবতঃ রক্ত উষ্ণকারী।

রামায়ণের সময়েও তমালপত্র যে অবিদিত ছিল, তাহা মনে হয় না। রাবণ যখন আকাশগামী রথে

† পঞ্জাব প্রদেশে প্রকাশিত কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এই প্রবন্ধ যখন 'সাহিত্য সভায়' প্রথম পঠিত হয়, তখন স্কন্দ পুরাণ বা পদ্ম পুরাণ বঙ্গদেশে প্রকাশিত হয় নাই।

আরোহণ করিয়া রামকে আক্রমণ করিবার জন্য নানা বন উপবন উদ্যান নদনদী পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন, রামায়ণে সেই সকল দৃশ্য অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই দৃশ্যসমূহ বর্ণনাকালে দেখিবেন বাল্মীকি একস্থলে ক্ষুদ্র মরীচগুল্মের সঙ্গে তমালের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই তমাল আমার মনে হয় ক্ষুদ্র তামাকের গাছ মাত্র—যথা,

কক্কোলানাঞ্চ জাত্যানাং ফলিনাঞ্চ সুগন্ধিনাম্।
'পুষ্পাণি চ তমালস্য গুল্মানি মরিচস্য চ।' *

জয়দেব যে তমালের ছায়ায় বনভূমি ঘোর হইয়া গেছে "বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই প্রকাণ্ড তমাল দ্রুমের পার্শ্বে ক্ষুদ্র মরিচগুল্মের একত্র উল্লেখ বাল্মীকির মত কবি কখনই করিতে পারেন না—তাহাতে বড়ই অসঙ্গতি দোষ হয়, তাহা হইলে তাঁহার কবিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ এই তমাল, তমালদ্রুম বা তমাল

* রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ৩৬ সর্গ।

তরু নহে ইহা তামাকের চারা, তাই তমালগুল্ম বা তামাকের চারা ক্ষুদ্র মরিচ-গুল্মের পার্শ্বে স্থাপিত। পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি তমাল ও মরিচ একই শ্রেণীর—শিরোবিরেচকগণের অন্তর্গত, তাই কবি বাল্মীকি উহাদিগের একত্র উল্লেখ না করিয়া যাইতে পারেন নাই। আরো আমাদের উক্তি সমর্থিত হয়, যখন দেখি ইহার সাতটী শ্লোক পূর্ব্বেই যেখানে প্রকাণ্ড তমালতরুর কথা বলা হইতেছে, সেস্থলে উহার বৃহত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য শাল তাল প্রভৃতি বড় বড় গাছের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থাপিত হইয়াছে। শুদ্ধ উপরোক্ত শ্লোকে নহে, রামায়ণে যেখানেই তমালতরুর (তমাল গুল্মের নয়) উল্লেখ আছে সেইখানেই শাল তাল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষের সঙ্গে একযোগে উক্ত হইয়াছে দেখা যায়। যথা,

শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ তরুভিশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ।”

অন্যত্র—

”শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসদ্রুমৈঃ।”

(আরণ্য কাণ্ড ১৫ সর্গ)

যখন চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণের সময়ে তমালপত্র বা তামাক জ্ঞাত ছিল, তখন রামায়ণে যে উহার প্রসঙ্গ থাকিবে তাহাতে আর বিস্ময় কি?

এতক্ষণ আমরা দেখাইলাম যে তমালপত্রই আজকালের তামাক এবং তামাকের ধূমপান অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে দেখা যাক্ ভারতে তামাকের প্রচলন সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দিগের মতামত কি? তাঁহাদের মতে ১৪৯২ খৃস্টাব্দে কলম্বস West Indies দ্বীপপুঞ্জে অসভ্যদিগের নিকট ইহার প্রথম সন্ধান প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালে কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে তামাকের ধূমপান প্রথম প্রচলিত হয়। য়ুরোপীয় গ্রন্থকারদিগের মতে—১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগে পোর্ত্তুগীজদিগের কর্ত্তৃক ইহা ভারতে, শুদ্ধ ভারতে কেন সমগ্র আসিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের মতে তামাকের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। এই মত সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়া আজ পর্য্যন্ত স্থির সত্যরূপে জগতে প্রতিভাত হইতেছে।

স্যার ওয়ালটার রেলে

ভারতের গাছগাছড়ার ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহার তুল্য বহুদর্শী ব্যক্তি খুব অল্পই আছেন সেই Watt সাহেব কৃত Economic products of India হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তামাকুর আধুনিকত্ব প্রমাণে যাহা য়ুরোপীয়দিগের সারযুক্তি সে সকলই তাহাতে দেখিতে পাইবেন—"In fact the entire absence of any allusion to the plant in the works of early travellers, and in the latest Sanskrit writings and the universal adoption of a foreign name for the plant, are strong arguments in favour of the conclusion that the use of tobacco was unknown to oriental nations before the beginning of the seventeenth century.

At this period the influence of the Portugese in the east was at its highest, and by all accounts it was through their means that the use of tobacco was first

made known in Persia. Arabia, India and China." * অর্থাৎ "আদিম পর্য্যটকদিগের বৃত্তান্তে এবং আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ইহার একান্ত উল্লেখাভাব এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার এক বিদেশীয় নামের প্রচলন, এই সুদৃঢ় প্রমাণবলে ইহা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাচ্য মহাদেশে তামাকুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল।

এইকালে প্রাচ্যভূখণ্ডে পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, এবং তাহাদের দ্বারাই নিঃসন্দেহ পার্সিয়া, আরব, ভারত এবং চীনদেশে তামাকু প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।"

তাহা হইলেই য়ুরোপীয় মত দাঁড়াইল যে, ভারতবাসীগণ ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে তামাকের ধূমপান য়ুরোপীয়দিগের কাছ হইতে শিক্ষা করেন। পাশ্চাত্যেরা কথায় কথায় প্রমাণ করিতে চান সর্ব্ববিষয়ে ভারত তাঁহাদিগের নিকট ঋণী। কিন্তু সত্যকে লুক্কায়িত রাখি-

* The Economic Products of India by George Watt.

বার উপায় নাই। তাই তাঁহাদের ভ্রান্ত মত পদে পদে খণ্ডিত হইয়া নূতন সত্যালোকে ভারতের জয়ঘোষণা করিয়া দেয়।

এক্ষণে দেখা যাউক তামাক সেবনের যন্ত্রাদি জগতে কোথা হইতে প্রচারিত হইল? অধুনাকালে তামাকু সচরাচর জগতে দুই প্রকারে সেবিত হয়। এক, চুরুটের ন্যায় ক্ষুদ্র বর্ত্তিকাকারে মুখে রাখিয়া তাহার ধূমপান, আরেক যন্ত্রে নলসংযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা ধূম সেবন। চুরুট, ষিগার, ষিগারেট, বিড়ী এই সকল প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত এবং হুকা, গুড়গুড়ি, সট্‌কা এই সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ধূমপানের এই দুই প্রকার উপায়ই যে ভারত হইতে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে এক্ষণে তাহাই দেখাইব।

সর্ব্বাগ্রে 'ষীগার,' 'ষিগারেট'কেই ধরা যাক। পাশ্চাত্যেরা অনুমান করেন 'ষীগার,' 'ষিগারেট' তাঁহারা স্পেনবাসীদিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন, এমন কি তাঁহারা বলেন, 'সিগার' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে স্পেনীয় ভাষা হইতে। Cigarএর উৎপত্তি নির্ণয়ে

তাঁহারা যে কিরূপ ভ্রান্ত মত প্রচার করিতেছেন, পাঠক-গণের কৌতুহল নিবারণের জন্য নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"The word Cigar is of course Spanish, and comes by an indirect route from the Spanish "Cigarra" a grasshopper. The 'Cigarra' is very frequent in Spanish gardens so that the word for a garden came te be 'Cigarral', and when the tobacco plant was first introduced into Spain from Cuba in the sixteenth century the Spaniards grew it in their gardens, and when duly prepared, rolled the leaf up for smoking as they had learned from the Indians. When one offered a smoke to a friend he would say, Es de mi cigarral'— 'It is from my garden.' Soon the expression came to be 'Estos cigarros de mi cigarral', and the word 'Cigar' speedily spread over

the world." * "যীগার শব্দটি নিশ্চয়ই স্পেনীয় শব্দ—উহার উৎপত্তি স্পেনীয় 'সিগারা' শব্দ হইতে, যাহার অর্থ 'ঘেসো ফড়িং'। এই ঘেসো ফড়িং স্পেনের বাগানে প্রায়ই দেখা যায়। এই ঘেসো ফড়িংএর নাম হইতে বাগানের নামই হইয়াছে 'সিগারাল'। যখন তামাকের চারা প্রথমে ষোড়শ শতাব্দীতে cuba হইতে স্পেনে আনীত হয়, স্পেন-বাসীরা তখন তাহা তাহাদের বাগানে রোপণ করে। পরে তামাকের পাতা তৈয়ারী হইলে উহা তাহারা ধূমপানের জন্য বর্ত্তিকাকারে গুটাইয়া রাখিতে শিখে। আমেরিকাবাসীদিগের নিকটই ইহা শিক্ষা করে। যখন কোন লোকে তাহার বন্ধুকে ধূমপানের জন্য চুরট অর্পণ করিত তখন সম্ভবতঃ বলিত 'es de mi cigarral'—অর্থাৎ 'ইহা আমার বাগানের'। এই রকমে স্পেনীয় বাগানের নাম 'cigarral' হইতেই 'cigar' শব্দ উৎপন্ন হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" কিরূপ কল্পনার দৌড় দেখুন! ঘেসোফড়িং হইতে

* Household Words.

বাগানের নাম হইল 'সিগারাল' এবং কিউবা হইতে আনিয়া প্রথমে তামাকের চারা স্পেনের বাগানে রোপণ করিল বলিয়া বাগানের নাম হইতে চুরুটের নাম হইল 'সিগার'! যে কোন প্রকারে হউক পাশ্চাত্যেরা দেখাইবেন যে কলম্বস কিউবা হইতে তামাক আনিবার পর জগতে চুরট প্রভৃতির আবির্ভাব। এ সকল মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ চুরটের প্রস্তুতপ্রণালী হইতে cigar নামের উৎপত্তি। এবং আমরা দেখাইব বহুপূর্ব্বে এমন কি বৈদিক যুগে ভারতে 'সীগার' 'ষীগার' প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ভারত হইতেই 'ষীগার' নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার যে বলিতেছেন 'ষীগার' শব্দের উৎপত্তি বাগানের স্পেনীয় শব্দ 'সিগারাল' হইতে, বস্তুতঃ তাহা নয়। এই 'cigar' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'ইষীকা' শব্দ হইতে হইয়াছে। ইষীকা অর্থে ঘাসবিশেষ—শর বা কাশতৃণ। বহু পূর্ব্বে বৈদিক যুগে এই কাশতৃণের চতুর্দ্দিকে ধূমপানের দ্রব্য লেপন করিয়া তাহা হইতে

কলম্বস

'বর্ত্তি' প্রস্তুত হইত, এবং সেই বর্ত্তিকাই ধূমপানের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হইত। এই 'ইষীকা' শব্দই 'ষীগার' (cigar) শব্দের মূল। স্পেনীয় ভাষায় যে ঘেসো ফড়িংএর নাম 'ষীগারা' হইয়াছে তাহাও এই ঘাসের সংস্কৃত 'ইষীকা' শব্দ হইতেই আসিয়া থাকিবে। রামায়ণে এই ঘাস অর্থেই 'ইষীকা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—

কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিণোদ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥ *

সংস্কৃত 'ইষীকা' বা 'ইষীকাবর্ত্তি' হইতেই 'ষীগার' বা 'ষীগারেট' উৎপন্ন হইয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। চরক সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটাদি সুপ্রাচীন ঋষিপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহ হইতে দেখাইতেছি, পুরাকালে ভারতে 'ইষীকা' হইতে ধূমপানের জন্য কিরূপে বর্ত্তি বা চুরট প্রস্তুত হইত। বাগ্‌ভটে লিখিত আছে—

* রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ৩০ সর্গ।

জলেস্থিতামহোরাত্রমিষীকাং দ্বাদশাঙ্গুলাম্।
পিষ্টৈর্ধূমৌষধৈরেবং পঞ্চকৃত্বঃ প্রলেপয়েৎ ॥
বর্ত্তিরঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূলা যবমধ্যা যথা ভবেৎ।
ছায়াশুষ্কাং বিগর্ভাস্তাং স্নেহাভ্যক্তাং যথাযথম্ ॥
ধূমনেত্রার্পিতাং পাতুমগ্নিপ্লুষ্টাং প্রয়োজয়েৎ ॥

"দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ একটী ইষীকা বা কুশতৃণ জলে ভিজাইয়া ধূমবিধানোক্ত ঔষধ সকল পেষণ করিয়া সেই পিষ্ট ঔষধ দ্বারা ক্রমশঃ এরূপ ভাবে পাঁচবার প্রলেপ দিবে, যেন উহার মধ্যভাগ অঙ্গুলবৎ স্থূল ও দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম হয়। পরে ঐ বর্ত্তিকা ছায়াশুষ্ক করিয়া উহার মধ্য হইতে কুশ অপনীত করিয়া যথাযথ স্নেহাভ্যক্ত করিবে এবং বর্ত্তির এক প্রান্ত ধূমনেত্রের অর্থাৎ ধূমপানের নলের (cigar pipe) এর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অপর প্রান্ত অগ্নিপ্লুষ্ট করিয়া উহার ধূমপান করিবে।" ধূমপানার্থ 'কল্ক' (বাঁটা তালপাকানো দ্রব্য) ইষীকাতে প্রলিপ্ত হইয়া ইষীকাকারে প্রস্তুত হইত বলিয়া 'ইষীকা'র বা শরকাঠির নামেই ধূমবর্ত্তি প্রসিদ্ধ হইয়া
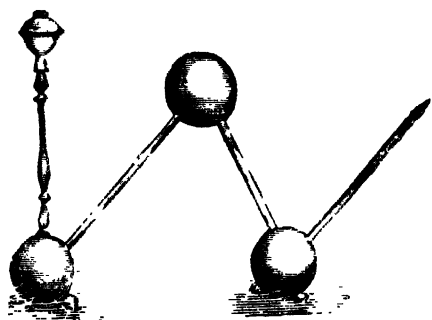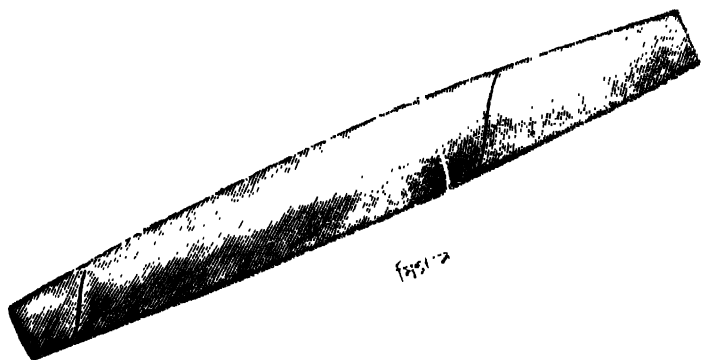
পড়িয়াছে। * 'ইষীকাবর্ত্তি' সংক্ষিপ্ত হইয়া অথবা কেবলমাত্র 'ইষীকা' শব্দের 'ই' লোপ হইয়া বিদেশী ভাষায় 'ষীগার'রূপে পরিণত হইয়াছে। অনেক সময়ে আকারান্ত শব্দের শেষে, উচ্চারণের সুবিধার জন্য 'র' আসিয়া জুটে—যেমন 'কর্ত্তা' শব্দের শেষে 'র' জুটিয়া পশ্চিমী ভাষায় 'কর্ত্তার্' হইয়াছে—যথা, "সৎকর্ত্তার্" 'ইষীকা'ও সেইরূপ উচ্চারণের সুবিধার জন্য 'ইষীকার' হইয়া থাকিবে। 'ইষীকা'র হইতে 'ষীকার' এবং ক্রমে 'ষীকার'এর 'ক' 'গ' হইয়া 'ষীগার' হইয়াছে ; যেমন 'বিকার'এর 'ক' 'গ' হইয়া 'বিগার' উচ্চারিত হয়। উপরোক্ত চুরট প্রস্তুত প্রণালী পাঠে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ঠিক আজকাল 'ষীগার' বা 'চুরটের' যেরূপ গঠন হয় সেইরূপ গঠন সেই বৈদিককালেও ছিল, আজকাল যেমন সিগারের মধ্যভাগ স্থূল হইয়া প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয় সেই প্রাচীন বৈদিক-যুগেও তাহাই ছিল। সুশ্রুতেও এই ইষীকা বা

* সিগারের দোকানে গিয়া দেখিয়াছি—আজকালও কোন কোন সিগারের মধ্যে শরকাঠির ন্যায় কাঠি প্রবিষ্ট করানো থাকে।

শরকাণ্ডে প্রলেপ দিয়া ধূমপানের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে।—"তত্র প্রায়োগিকে বর্ত্তি হৃপগতশরকাণ্ডাং নিবাতাতপশুষ্কামঙ্গারেষ্ববদীপ্য নেত্র-মূলস্রোতসি প্রযুজ্য ধূমমাহরেতি ব্রূয়াৎ।" অর্থাৎ "প্রায়োগিক ধূমপানে শরকাণ্ড হইতে বর্ত্তি নিষ্কাশিত, নিবাতাতপে সংশুষ্ক ও অঙ্গারাগ্নিতে অবদীপ্ত এবং তাহা নেত্রমূল ছিদ্রে প্রবিষ্ট করাইয়া ধূমপানের জন্য বলিবে।"

ধূমবর্ত্তি প্রস্তুতের জন্য চরকও ঐ একই প্রক্রিয়ার উপদেশ দিযাছেন।—"পিষ্ট্বা লিম্পেচ্ছরেষীকাং তাং বর্ত্তিং যবসন্নিভাং।"

"ধূমপানের দ্রব্যগুলি জলে বাঁটিয়া যবমধ্যাকার ইষীকায় (শরকাণ্ডে) লেপ দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।" "এতদ্ভিন্ন শার্ঙ্গধর ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই ঐ ইষীকায় লেপন করিয়া ধূমবর্ত্তি প্রস্তুতবিধান লিখিত আছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে ধূমবর্ত্তি প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ ছিল 'ইষীকা'। ক্রমে তাই

'ইষীকা' ও 'ধূমবর্ত্তি' একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ইষীকা শব্দের মধ্যস্থিত মূর্দ্ধণ্য 'ষ'য়ে দীর্ঘ 'ঈ' যুক্ত থাকায় উচ্চারণকালে সহজেই পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বইকার লোপ হইয়া যায়। এইরূপে 'ইষীকা'র পরিণতি 'ষীকা' হওয়া স্বাভাবিক। ক্রমেয় 'ষীকা' ভাষান্তরিত হইবার কালে শব্দের শেষে 'র' যুক্ত হইয়া ও 'ক' 'গ' হইয়া য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে 'ষীগার' (cigar) রূপে পরিণত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের ধূমবর্ত্তি যে ক্রমে ভারতে বিলাস-সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কারণ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থাদিতেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরী গ্রন্থে শূদ্রক রাজার বর্ণনাকালে তাম্বুল সেবনান্তে "পরিপীত ধুমবর্ত্তি" বলিয়া চুরট পানের কথা স্পষ্টই লিখিত আছে। এই 'ধুমবর্ত্তি' তমালপত্র বা তামাকের ধুমবর্ত্তি বা অন্য কোন দ্রব্য-প্রস্তুত বর্ত্তি তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ঐ ধুমবর্ত্তি যে 'ষিগার' বা চুরট তাহা স্থির। এই 'ধুমবর্ত্তি' শব্দ কাদম্বরীর নিজস্ব নহে, উহা বৈদিকযুগের

ঋষি-উচ্চারিত শব্দ, যথা—'ধুমবর্ত্তির্পিবেদ্গন্ধৈঃ সকুষ্ঠ-স্তগরৈস্তথা।'

(চরক চিকিৎসাস্থান ২৬ অধ্যায়)

"কাদম্বরীর ন্যায় কাব্যগ্রন্থে বিলাসসামগ্রীরূপে চুরটপানের কথা দেখিয়া বুঝা যায় ইহা কাদম্বরীর কালে অন্ততঃ বিলাসসামগ্রীরূপে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কাদম্বরী বড় আজকালের গ্রন্থ নহে। কাদম্বরী গ্রন্থকার প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে শিলাদিত্য রাজার সভায় নিযুক্ত ছিলেন। শিলাদিত্যের রাজত্ব-কাল খৃষ্টাব্দ ৬১০ হইতে ৬৫০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোথায় য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে কলম্বসের আবির্ভাবের পর, ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র চুরট বা যিগারের প্রচলন, আর কোথায় যুগযুগান্তর পূর্ব্বের চরকসুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে এবং ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বের সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ! একবার ভাবিয়া দেখুন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক গণের মতে ও প্রকৃত সত্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ!

শুদ্ধ যিগার বা চুরট কেন এই আমাদের স্বদেশ-

প্রচলিত 'হুঁকা' বা 'গুড়গুড়ি' প্রভৃতিও সেই বৈদিক যুগেরই আবিষ্কৃত। আমাদের দেশীয় লোকদের মধ্যে সাধারণতঃ সকলেরই এক ধারণা আছে এই যে, 'হুক্কা' প্রভৃতি তামাকু সেবনের যন্ত্র মুসলমানেরা ভারতে আনয়ন করেন। য়ূরোপীয় পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে একেবারে মোহমগ্ন, তাই হুক্কা ও গুড়গুড়ি প্রভতির আবিষ্কারের ভার মোগলসম্রাট আকবর শাহার স্কন্ধে তাঁহারা চাপাইতে চাহেন। প্রায় মাসাধিক কাল হইল কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সম্বাদপত্রে এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এই মর্ম্মে যে, দিল্লীশ্বর আকবর শাহার রাজত্বকালে হুক্কা যন্ত্র প্রথম আবিষ্কৃত হইয়া তৎকর্ত্তৃক উহা ভারতে প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ইংরাজের এ সকল কথা 'খলাসাৎ তবারিখ' প্রভৃতি মুসলমান গ্রন্থের প্রতিধ্বনি মাত্র। কারণ ঐরূপ দু একটী মুসলমান ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তামাক আকবরশার রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজেরা ভারতে আনয়ন করে এবং তামাকের সঙ্গে সঙ্গে 'হুক্কা' প্রভৃতির প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞের বাক্য।

হুঁকা যন্ত্রের আবিষ্কারের জন্য যদি কাহাদের ধীশক্তির প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে হয় ত সে বৈদিক ঋষিদিগের। হুকাযন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ঋষিদিগের আবিষ্কৃত। হুক্কার সেই কল্কে, সেই খোল, সেই দীর্ঘ নল ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—হুক্কা আকবর শাহার উদ্ভাবিত নয়। হুক্কা ও গুড়গুড়ি প্রভৃতি নামের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই, উহারা আরবী বা পারসী শব্দ নহে, অথবা সংস্কৃতও নহে, ধূমপানের সময় হুক হুক বা গুড় গুড় শব্দ উত্থিত হয় বলিয়া ঐ সকল নাম চলিত হইয়া গেছে। কিন্তু হুক্কার 'কল্কে', যাহাতে তামাক সাজা হয়, সেই 'কল্কে' নামটি সংস্কৃত; উহাতে কল্কদ্রব্য (বাঁটা তাল-পাকানো দ্রব্য) রাখা হয় বলিয়া উহার নাম 'কল্কে' হইয়াছে। বস্তুতঃ তামাক খাইতে হইলে চুরটের ন্যায় শুষ্ক তামাক পাতায় খাওয়া চলে না। তামাক কুট্টিত করিয়া উহাতে গুড় প্রভৃতি নানা উপকরণ ও সুগন্ধিদ্রব্য সম্মিশ্রণে কল্ক (বাঁটা জিনিষ) প্রস্তুত করিয়া উহা 'কল্কে' বা কল্কাধারে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি-সংযোগে খাইতে হয়। 'কল্ক' শব্দটি আয়ু-

কল্কেসহ ডাবা হুঁকা
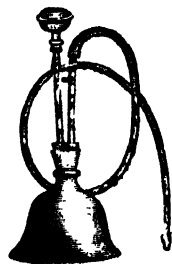
গুড়গুড়ি

র্ব্বেদেই বিশেষ ব্যবহৃত হয় ; কোন বাঁটা তাল-পাকানো জিনিষের নাম 'কল্ক'। কল্ক শব্দ হইতে 'কল্কে'র উৎপত্তি। 'কল্কে' অর্থাৎ 'কল্কীয়' বা 'কল্কাধার'। এই 'কল্কাধার'এর আরও তুইটি নাম আছে—'মল্লকসম্পুট' অর্থাৎ ঢাকনি-বিশিষ্টমালা ও শরাবসম্পুট বা ঢাকনিবিশিষ্ট শরা। এই কল্কাধারে যেরূপে 'নলিকা' সংযুক্ত করিয়া ধূম পীত হইত তাহাও চরক হইতে প্রদর্শিত হইতেছে :—

দশাঙ্গুলোন্মিতাং নাড়ীং অথবাষ্টাঙ্গুলোন্মিতাং।
শরাবসম্পুটচ্ছিদ্রে কৃত্বা জৃম্ভাং বিচক্ষণঃ।
বৈরেচনং মুখেনৈব কাসবান্ ধূমমাপিবেৎ ॥

অর্থাৎ "দশ বা আট আঙ্গুল পরিমিত নল কল্কের ছিদ্রে যুক্ত করিয়া মুখের দ্বারা বৈরেচন ধূমপান করিবে।" ঠিক আজকাল যেমন কল্কের ছিদ্রে হুকার নল যুক্ত থাকে সেই প্রাচীনকালেও সেইরূপ করা হইত।

হুঁকার নলিকাটী কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও বলিতেছি—

ঋজুত্রিকোষাফলিতং কোলাস্থ্যগ্রপ্রমাণিতং।
বস্তিনেত্রসমদ্রব্যং ধূমনেত্রং প্রশস্যতে ॥

"ধূমনলিকা ত্রিকোষাফলিত হইবে অর্থাৎ নলিকা-টীকে তিনটী কোষ বা খোলের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু নলিকার প্রত্যেক দণ্ড ঋজু বা সরল হওয়া আবশ্যক। নলের অগ্রভাগের ছিদ্র কুলের আঁটীর প্রমাণ হইবে। ধাতু কাষ্ঠ, অস্থি, ও বেণু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে বস্তিনল প্রস্তুত করিতে হয় ইহাও সেই সেই দ্রব্যে প্রস্তুত করিতে হইবে।" *

এখনকার হুকার নলিকা 'ত্রিকোষাফলিত' করা হয় না।—একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া 'এককোষাফলিত' করা

* চরক সূত্রস্থান ৫ম অধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ চরকের অনুবাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশ কবিরত্ন মহাশয় তৎকৃত চরকের অনুবাদে 'ত্রিকোষাফলিত' শব্দের 'ত্রিবঙ্কুর' অর্থ করিয়াছেন। অনুবাদোল্লিখিত "ত্রবঙ্কুব" শব্দের ঠিক মর্ম্ম বুঝা গেল না—বোধ হয় 'তিনটী খাঁজে বিভক্ত' এই ভাব ব্যঞ্জনা করিতেছে। কিন্তু চরকোক্ত "ত্রিকোষাফলিত" শব্দ কত সহজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে দেখুন—"ত্রিকোষাফলিত" শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে তিনটী কোষ বা খোলের মধ্য দিয়া ফলিত—অনুবাদক মহাশয় সে বিষয়ে কোন লক্ষ্যই করেন নাই।

হয়। এখনকার হুঁকায় প্রথমে 'কল্কের' ছিদ্রে একটী নল সংযুক্ত করিয়া সেই নলটী একটী কোষে বা ডাবের খোলে প্রবিষ্ট করান হয়, এবং তাহার সহিত আরেকটী নল সংশ্লিষ্ট করিয়া কল্ক দ্রব্যের ধূম পীত হয়। পুরাকালে নলিকাটী 'ত্রিকোষাফলিত' করিবার কারণ ধূমের তীক্ষ্ণতা লাঘব করা,—Nicotine দূর করা। কিন্তু এক্ষণে একটী কোষেরই মধ্যে জল স্থাপিত করায় ধূমটী জলের মধ্য দিয়া আসাতে তাহা সহজেই সম্পন্ন হয়, তাই আর 'ত্রিকোষাফলিত' করিবার আবশ্যক হয় না। ইহা ত গেল ডাবা হুঁকার কথা। মুসলমানী হুকায় নলটীকে অনেক সময়ে তুফের্তা বাঁকাইয়া প্রবেশ করাইয়া দেয়। বড় বড় বৈঠকখানায় 'সট্‌কা' বা 'গড়গড়া'র যে কুণ্ডলাকৃতি নল পড়িয়া থাকে তাহাও সেকালেরই প্রবর্ত্তিত। অনেক সময়ে নলটী দীর্ঘ নাড়ীর আকারে নির্ম্মাণ করা হইত বলিয়া উহার আরেক নামই ছিল 'নাড়ী'। নলটী যত দীর্ঘ পর্ব্বচ্ছিন্ন (অর্থাৎ পর্ব্বে বিভক্ত) হইবে, চরকের মতে ধূম ততই অধিক গুণকারী হইবে।—

দূরাদ্বিনির্গতঃ পর্ব্বচ্ছিন্নো নাড়ীতন্মুকৃতঃ।
নেন্দ্রিয়ং বাধতে ধূমো মাত্রাকালনিষেবিতঃ॥

"দূরাগত নলিকান্তর্গত যে ধূম পর্ব্বচ্ছিন্ন এবং ক্রমশঃ সুক্ষ্মতর ভাবে আগত, সেই ধূম যথা মাত্রায় এবং যথাকালে সেবিত হইলে ইন্দ্রিয়ের কোন হানি হয় না।" এই কারণেই দীর্ঘ নলবিশিষ্ট গড়গড়া প্রভৃতি বড়লোকের বৈঠকখানায় সৌখীন আয়েশের সামগ্রীরূপে স্থান পাইয়াছে। এক্ষণে পাঠক বলুন দেখি হুঁকার কোন্ জিনিষটী আকবর শাহার উদ্ভাবিত বা মুসলমানদের আমলে প্রবর্ত্তিত। প্রকৃত কথা এই যে, cubaর অসভ্যদিগের মধ্যে ধূমপান প্রচলিত দেখিয়া য়ুরোপীয়দিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাতে মাথা ঘুরিবার কোন কারণই আমরা দেখি না। প্রথমে কোন এক যন্ত্র সুসভ্য মানবসমাজে আবিষ্কৃত হইলে তাহা কালক্রমে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসভ্য-সমাজেও বিস্তারিত হইয়া পড়ে। এই কারণে ভারতীয় ক্ষত্রিয়দিগের ধনুর্ব্বাণ অতি অসভ্যজাতির মধ্যেও অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। আজকাল যেমন সভ্যজাতির

আবিষ্কৃত বন্দুক প্রভৃতি যন্ত্র অশিক্ষিত অসভ্যরাও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, ধূমপানের যন্ত্রাদিও সেইরূপ মহা মহা জ্ঞানী ঋষিদিগের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়া জগতের চতুর্দ্দিকে দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কেবল আমেরিকার cubaয় কেন ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের ঘোর অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও তামাক ও ধূমপানের প্রচলন বহুকাল হইতে দেখা যায়। নিউ-গিনির অসভ্যজাতি 'পাপুয়ান্'দিগের মধ্যে য়ুরোপীয়-দিগের আগমনের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে যে তামাক ও ধূমপানের বিশেষ আদর ছিল তাহা কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মানবজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত হ্যাডন সাহেব তৎকৃত 'হেড-হাণ্টার্শ' নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন। 'Although smoking was practised in these islands before the white men came, and they grew their own tobacco, they never smoked much at a time. The native pipe is made of a piece of bamboo from about a

foot to between two and three feet in length. * * * * They enjoy it greatly and value tobacco very highly, they will usually sell almost anything they possess for same.' *

এক্ষণে শ্রোতৃবর্গের মনে একটী এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তামাকের প্রকৃত জন্মস্থান কোথায়? তাহার উত্তরে এই বলি যে, যখন বৈদিক যুগ হইতে তামাক ভারতে প্রচলিত, তখন তামাক যে ভারতের সামগ্রী সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। আমার মনে হয় তামাকের আদি জন্মস্থান ভারতের দাক্ষিণাত্য। প্রাচীনকালে অন্ততঃ ভারতবাসীরাই এইখানে ইহার প্রথম সন্ধান প্রাপ্ত হন। এক্ষণেও দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীর উৎকৃষ্ট তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। Madras Manual Abministration পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখুন গোদাবরী দেশোৎপন্ন তামাকের কত না প্রশংসা!—"Tobacco is grown more or

---

* Head-Hunters by Alfred Haddon Sc. D. F. R. S.

less throughout the presidency, with the exception of Malabar and the Hill ranges, but the chief localities of production are the alluvial lands of the Godabari district, where is grown the well known 'Lunka' tobacco (so named from the lunkas or river islands on which it is cultivated), and parts of the Coimbatore and Madura districts, from which the Trichinopoly cheroot manufacturers draw their supplies of raw material. * * * * Of the more esteemed tobaccos used for European consumption, the best of the Godabari produce is grown on these alluvial lands which receive rich deposits of silt in the river floods and are out of the influence of the sea freshes. * "কেবল মালাবার

* Madras Manual of Adminstration, Vol. I, 292 (1885.)

ও পার্ব্বত্য অঞ্চল ভিন্ন মাদ্রাজ প্রদেশের সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে তামাকু উৎপন্ন হয়, কিন্তু গোদাবরীর তীর বা চরপ্রদেশ তামাক উৎপত্তির জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইস্থানে ও কইম্বাটুর ও মাদুরা জিলার কোন কোন অংশে সুপ্রসিদ্ধ 'লঙ্কা' তামাক উৎপন্ন হয়, ত্রিচিনপল্লীর 'ষীগার' প্রস্তুতকারীরা এইখান হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। 'লঙ্কা' তামাক নাম হইয়াছে নদীমধ্যস্থিত দ্বীপের নামে। নদীমধ্যস্থিত দ্বীপকে ঐদেশে লঙ্কা বলে। এই লঙ্কা তামাক য়ুরোপীয়দিগের বড়ই প্রিয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট লঙ্কা তামাক একমাত্র গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশেই উৎপন্ন হয়।" বেন্‌সন্ সাহেব বলেন "গোদাবরীতীরপ্রদেশে সর্ব্বত্র তামাক সহজে উৎপন্ন হয়—"Tobacco seems to be grown on any part of the Lankas almost indifferently." † গোদাবরী অঞ্চল তামাকের দেশ বলিয়া, এই প্রদেশের লোকেরাও সাধারণতঃ তামাকের অতিমাত্রায় ভক্ত।

---

† Economic Products of India গ্রন্থে উদ্ধৃত Benson সাহেবের উক্তি।

য়ুরোপীয়েরা এই গোদাবরী অঞ্চলে নানাস্থানে ষীগারের কারখানা খুলিয়া দেশবিদেশে প্রেরণ করিতেছেন। এইপ্রদেশ হইতে যত 'ষীগার' দেশদেশান্তরে প্রেরিত হয়, এত 'ষীগার' ভারতের অন্য কোনস্থান হইতে প্রেরিত হয় না।

এখনকার ন্যায় পুরাকালেও এ অঞ্চলে তামাকের গাছ স্বভাবতই উৎপন্ন হইত; তাই রাবণ যখন গোদাবরীতীরস্থিত রামকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তখন পথিমধ্যে অন্যান্য তরুগুল্মের সঙ্গে গোদাবরী অঞ্চলোৎপন্ন এই তামাকের গাছও দেখিতে দেখিতে গিয়াছিলেন—এবং তাহাই রামায়ণে 'তমাল' নামে মরিচগুল্মের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।—

পুষ্পাণি চ তমালস্য গুল্মানি মরিচস্য চ।
মুক্তানাঞ্চ সমূহানি শুষ্যমাণানি তীরতঃ॥ *

---

* রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড ৩৫ সর্গ। এস্থলে তমাল ও মরিচের পরেই 'শুষ্যমাণানি' এই বিশেষণ থাকাতে শুষ্ক তমাল পত্র অর্থাৎ তামাকের শুক্না পাতার কথা সহজে মনে উদয় না হইয়া যায় না। বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে প্রকাশিত রামায়ণে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তর্করত্ন

প্রকৃত কথা এই, ভারতের দাক্ষিণাত্য সেই পুরা-কালে রাক্ষস প্রভৃতি অসভ্য বনচরদিগের নিবাস ছিল; গোদাবরী তীরোৎপন্ন তামাকের ব্যবহার তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল না। ক্রমে তাহারা যখন আর্য্যবলের নিকট পরাভূত হইয়া দেশদেশান্তরে পলায়ন করিল সম্ভবতঃ তাহারা তখন তামাকও তাহাদের সঙ্গে সেই সকল দেশে লইয়া গিয়াছিল। সেই কারণে এক্ষণে অসভ্য-নিবাস দূর দূর সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জেও বহুকাল হইতে তামাকের প্রচলন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। গোদাবরী প্রদেশ যে তমালপত্র বা তামাকের জন্য বহু পুরাকালে হইতে প্রসিদ্ধ ছিল, উক্ত প্রদেশবাসী লোক-দিগের জাতীয় নাম হইতেও তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গোদাবরীঅঞ্চলবাসী লোকদিগের জাতীয় নাম যে 'তামিল', এই 'তামিল' শব্দ সম্ভবতঃ

মহাশয় 'শুষ্যমাণাণি' শব্দকে কেবলমাত্র মরিচের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া 'মরিচের শুষ্ক গুল্ম' অনুবাদ করিয়াছেন। আমার মনে হয় এস্থলে 'শুষ্যমাণাণি' শব্দ তমাল ও মরিচ উভয়েরই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'তমালী' হইতে আসিয়াছে, তমালী কিনা তমাল ব্যবসায়ী বা তমালদেশবাসী। তামাক বা তমালের সহিত বহুকাল হইতে সংশ্লিষ্ট বলিয়া উহারা 'তমালী' বা 'তামিল' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তামাকের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া কেহই কলম্বসকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। সভ্য-জগতে তামাক প্রচলনের মূলে যে কলম্বস, য়ুরোপীয়েরা এ কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত। এমন কি ইংরাজের জ্ঞানভাণ্ডার 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' যাহাতে মহা মহা পণ্ডিতগণের একত্র সমাবেশ, তাহা-তেও তামাক সম্বন্ধে ঐ একই কথা ব্যতীত কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রিটানিকা বলেন—১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস 'কিউবা' অনুসন্ধান করিতে গিয়া দৈবক্রমে তদ্দেশবাসী অসভ্যদিগের নিকট হইতে তামাকের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এবং সেই অবধি তামাক সভ্যজগতে প্রবেশ লাভ করিয়া নানাপ্রকারে ব্যবহৃত হইতেছে। "There can not be a doubt that the know-

ledge of tobacco and its uses came to the rest of the world from America. In November 1492 a party sent out by Columbus from the vessel of his first expedition to explore the island of Cuba brought back information that they had seen people who carried lighted firebrand to kindle fire, and perfumed themselves with certain herbs which they carried along with them." কিন্তু আমরা উপরে যে সকল প্রমাণ দেখাইয়া আসিলাম তাহাতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের এই উক্তি বালভাষিতরূপে প্রতিপন্ন না হইয়া যায় না। এক্ষণে আমরা নিঃশংসয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে তামাক ভারতের নিজস্ব সামগ্রী, বিদেশানীত নহে। তামাকের ব্যবহার বৈদিক ঋষিদিগের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। 'ষীগার' 'চুরট' 'হুঁকা' 'কল্কে'প্রভৃতি তামাকের যন্ত্রসমূহ ঋষিদিগের কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়া ভারত হইতে দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি কলম্বস জন্মগ্রহণের যুগ-

যুগান্তর পূর্ব্বে 'ষীগার' প্রভৃতি ভারতে বিলাস-সামগ্রী-রূপে পরিণত হইয়াছে। *

* ১৩১৫ সালের ২৯শে পৌষ সাহিত্যসভার ৯ম বার্ষিক ৭ম মাসিক অধিবেশনে (২৬ বৎসর পূর্ব্বে) প্রপঠিত।

"সুন্দর সুললিত প্রাঞ্জল কবিতাগুলি পাঠ করিলেই হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া প্রসন্নতা আনয়ন করে, ইহাই 'সপ্তস্বর' খণ্ডকাব্যের বিশেষত্ব। চিত্রকর তুলি-দ্বারা চিত্রের সুপবিত্র গুপ্তভাব সকল চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করেন, সুকবি চিত্তাকর্ষক মনোহর বাক্যবিন্যাস দ্বারা হৃদয়রাজ্য অধিকার করেন। কাব্য ও কবিতার সহিত চিত্তাকর্ষক চিত্রের যেরূপ মিলন হওয়া আবশ্যক, তাহার সার্থক মিলন হইয়াছে। কবিতা পাঠান্তে বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপ চিত্র পাঠকেব চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইহাকেই কাব্যের প্রসাদগুণ বলে। আমাদের বিশ্বাস অভিজ্ঞ চিত্রকরের অঙ্কিত দর্শনকারি. সুন্দর চিত্র ও সুকবি বিরচিত হৃদয়গ্রাহী কবিতা উভয়ের তারতম্য অতি অল্প। যে চিত্রে প্রকৃতিতে সুন্দর ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাই সুচিত্র এবং যে কবিতার রচনা সরল স্বাভাবিক সুললিত ও হৃদয়-গ্রাহী বাক্যে বিষয় সকল বর্ণিত হয়, তাহাই সুকাব্য। 'সপ্তস্বর'—খণ্ড কাব্যখানি উভয়গুণে গৌরবান্বিত; গ্রন্থকার একজন প্রতিভাশালী সুকবি, কবিতাগুলির অধিকাংশই পবিত্রভাব পূর্ণ ; প্রত্যেক কবিতায় কবির

কবিত্বের প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, আমরা 'সপ্তস্বর' খণ্ড কাব্যখানি পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীত হইলাম।"

জন্মভূমি ফাল্গুন, ১৩২৩।

"কবিতাগুলির পরিচয়ে নূতনত্বের বিকাশ। এই গ্রন্থ-নিবদ্ধ কবিতাগুলি সাতটী সুরে বিভক্ত—যেন সাতটী সুরের ধাপ ইহাতে ক্রমান্বয়ে উঠিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতাজ্ঞ যে কেহ কবিতা পড়িয়া যে আনন্দ লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

"রসাত্মকং বাক্যং কাব্যং"

"আনন্দ বিশেষ জনকং বাক্যং কাব্যং"

যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আলোচ্য গ্রন্থে যে ইহার মর্য্যাদাহানি হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায়। কবিতাগুলি হেয়ালিতে বা অস্পষ্টতায় দুষ্ট নহে।"

বঙ্গবাসী ২রা আষাঢ় ১৩২৪।

'ছবিগুলি ভাল। কবিতাগুলির সম্বন্ধেও আমাদের এই কথা। কোথাও ভাবের জটিলতা নাই; অর্থবোধে বিভ্রাট নাই। ছন্দগুলির গতি অবাধ। **সপ্তস্বর,**

'কণ্বমুনির আশ্রম,' 'কণ্বের কুটীর,' 'গার্গী,' 'বশিষ্ঠ', 'বিশ্বামিত্র' প্রভৃতি কবিতাগুলি উচ্চভাব পূর্ণ। 'ভক্ত' কবিতাটী অতি সুন্দর। বাঙ্গালী পাঠক 'সপ্তস্বর' পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিবেন, এমন আশা আমাদের অছে।„

অর্ঘ্য আষাঢ় ১৩২৪।

"গ্রন্থকার প্রার্থনা করিয়াছেন—"হৃদয়ের শিখরে সঙ্গীতের যে ক্ষুদ্র নির্ঝর ছুটিয়াছে তাহা সুবিশাল ভাব-নদীতে পরিণত হইয়া জীবনের উপকুল প্লাবিত করুক।" স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক আমরাও উহাতে সর্ব্বান্ত-করণে যোগদান করি। লেখকের যৌবন প্রারম্ভের প্রথম উদ্যমের সাফল্যস্বরূপ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।" উদ্বোধন চৈত্র ১৩২৩

গ্রন্থকারের আর একখানি কাব্যের
মধুর ঝঙ্কার—

পদরাগ

সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য মাত্র—৸৹

পদরাগের সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত :—

"গানগুলি সুরচিত ও হৃদয়গ্রাহী, প্রত্যেক গানের ভিতর দিয়া ভক্তিরসের পবিত্র ধারা বহিয়া গিয়াছে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।"

হিতবাদী ১২ই আশ্বিন, ১৪২৮।

জন্মভূমির সম্পাদক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কি বলিতে-ছেন দেখুন—

"আপনার রচনার আমি একজন বিশিষ্ট ভক্ত, সাহিত্যামোদী পাঠকেরাও ভালবাসেন, ইহা আমার তোষামোদ বাক্য নহে, আন্তরিক উচ্ছ্বাস।" ২০-৩-২৪।

বাণীর কমলবনের মধুর সাহিত্যিকদিগের লীলাভূমি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির কয়েকটী মাত্র অভিমত পাঠ করিলেন।

"গণেশ"

লেখক—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ||০ আনা

গণেশকে আমরা কেবলমাত্র হিন্দুদেবতা বলিয়াই জানি। হিন্দুরা গণেশকে পূজা না করিয়া যেমন অন্য কোন দেবতার পূজা করেন না তেমনি এই গ্রন্থে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে শুধু হিন্দুরা কেন অজানিত অবস্থায় গণেশ পাশ্চাত্য দেশেও প্রথম পূজা পাইয়া আসিতেছেন। গ্রন্থকারের বহু গবেষণার ফল এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কৌতুহল নিবারণ করুন।

"গণেশ" 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত।

"বাগান" "পদরাগ" ও "গণেশ" সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ পত্রাদির মতামত।

বাগান

"BAGAN" BY RITENDRA NATH TAGORE. Price Re 1-8

"This is a small book of poems written in beautiful bengali. This author is already well-known in the field in Bengali literature and most of the pieces in the book have sustained that reputation. Some of the poems such as Ritumalika, Rajgiri and Bihangadut deserve special mention. A number of tricoloured pictures has enhanced the beauty of the publication".

Amrita Bazar Patrika.

"বাগান" শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাগান পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কবি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কবির যে সকল গুণ থাকা দরকার ঠাকুর বাড়ীর প্রত্যেক যুবকেরই দেখিতেছি সে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। বাগানের প্রত্যেক ফুল গাছটি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম তাহার প্রত্যেক ফুল হইতে একটা সরল আনন্দময় ভাবসৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাগান কতকগুলি কবিতার সমষ্টি মাত্র। সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পাঁচফুলের গাছে যেমন বাগান সাজায়, ঋতেন্দ্র বাবুও নানা কবিতায় তাহার কাব্য-বাগান সাজাইয়াছেন। এবং সে বাগান হইতে যে ভ্রমর গুঞ্জন আমরা শুনিতে পাইলাম সেই গুঞ্জনে মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন "আসি হেথা ঋতুরাজ পুলকে মাতায়; তরুলতা পরে সাজ নবীন পাতায়।" এ সরল উক্তি। পুনঃ এক জায়গায় লিখিয়াছেন "আমার জীবন পাতে নব নব লেখা, স্বর্ণাক্ষরে ফুটে ওঠে পেলে তব দেখা।"

কবি আপনার বাগান খানি নানা স্তরে সাজাইয়াছেন। প্রত্যেক স্তরই বিশেষ নিপুণতার সহিত

গড়িয়াছেন। তাঁহার ঋতু মালিকা, পল্লীদৃশ্য, বিহার, বিহঙ্গদূত, কাকলি, মালঞ্চ, বীথিকা পঞ্চবটী ও গীতি নিকুঞ্জ, এই বিবিধ স্তরে সাজান বাগানে বাঙ্গালীর কাব্য কাননের মধুর স্বর যিনি শুনিতে ইচ্ছা করেন তিনিই একবার ঋতেন্দ্র বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইবেন। আনন্দ পাইবেন। তাঁহার বাগানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন।"

"দৈনিক নায়ক"
১৩ই আশ্বিন ১৩৩৩—

"কাব্যামোদীর নিকট ঋতেন্দ্র নাথের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবেনা, 'সপ্তস্বর' 'পদরাগে' যে ভাব ভাষা ঝঙ্কৃত হইয়াছিল 'বাগানে' তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'ঋতুমালিকা,' 'বিহঙ্গদূত,' 'রাজগিরি' কাব্য জগতে একটা সাড়া আনিয়াছে। 'গীতি-নিকুঞ্জের' গানগুলি আমাদের মন মুগ্ধ করিয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরার বড় ঠাকুর ও গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীমান সুভগেন্দ্র নাথের অঙ্কিত কতগুলি ত্রিবর্ণ চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থের আশায় রহিলাম।"

'দীপালী' সপ্তাহিক।

পদরাগ

পদরাগ—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য বার আনা।

"এখানি গানের বহি। গানগুলি সুরচিত ও হৃদয়-গ্রাহী প্রত্যেক গানের মধ্য দিয়া ভক্তিরসের পবিত্র ধারা বহিয়া গিয়াছে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।"

হিতবাদী—১১ই আশ্বিন—১৩১৮

'পদরাগ' শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৸০ বার আনা।

"স্বদেশী কাগজে সুন্দর ছাপা। পদগুলি বড়ই সুন্দর। রুচি যেমন মার্জ্জিত, ভাব তেমনি বিশুদ্ধ। অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে। নীতি ভক্তি জমাট হইয়া পদরাগে ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। এই পুস্তক মহর্ষি ঠাকুর পরিবারের অক্ষয় গৌরব ঘোষণা করিবে।"

"নব্যভারত" কার্ত্তিক ১৩১৮।

গণেশ

A Homage To Lord Ganesh.

"It is the first booklet of the Hindu Parisad series edited by Babu Ritendra Nath Tagore, Zaminder Calcutta. Babu Ritendra Nath is a well-known author and journalist. Lord Ganesh a well-known Hindu Divinity and the destroyer of all evils is worshipped by all Hindus at the very outset. The writer of this pamphlet has tried his best to prove that the first letter of the sanskrit, English, Roman, Greek, Hebrew, Phinician and Egyptian alphabet owes its origin from the head of the Hindu divinity. Ritendra Babu's philological research and investigation are very interesting no doubt. Our readers will get ample food for contemplation by the perusal of this booklet. We wish its wide circulation." Its price is annas 8 only.

To be had Of the author at 6—1 A Dwarka Nath Tagore Lane, Calcutta.

Diamondharbour "Hitaishi". 15th April 1929.

বঙ্গীয় "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকার সম্পাদক "গণেশ" পাঠ করিয়া কি লিখিয়াছেন দেখুন।—

'আপনার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'গণেশ' আমরা 'কায়স্থ সমাজ' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চাই। আশা করি তাহাতে আপনার মত পাইব। ইহা আপনার অভিনব সৃষ্টি সন্দেহ নাই।'

২০শে জৈষ্ঠ ১৩৩